জীবন জাগার গল্প-৪
থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে
মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে

জীবন জাগার গল্প

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

শুরুর কথা

*** জীবনটাই আসলে অনেকগুলো গল্প। অসংখ্য গল্প দিয়েই একটা জীবন গঠিত হয়। বৃষ্টির ফোঁটার মতোই প্রতিনিয়ত গল্প ঝরে পড়ছে। শিশির বিন্দুর মতোই। কোনওটা হাসির, কোনওটা কান্নার। কোনওটা আনন্দের, কোনওটা বেদনার। কিছু গল্প ছোট, কিছু গল্প বড়। কিছু গল্প নিজেকে নিয়ে, কিছু গল্প অন্যকে নিয়ে। কিছু গল্প জীবনের, কিছু গল্প মরণের। কিছু গল্প আশার, কিছু গল্প নিরাশার। কিছু গল্প প্রেরণার, কিছু গল্প চেতনার। কিছু গল্প সাধনার, কিছু গল্প আরাধনার। কিছু গল্প আজকের, কিছু গল্প আগামীর।

*** আমরা এই গল্পগুলোকে কুড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। একটি ফ্রেমে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের উপস্থাপনাতে দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু আগ্রহ ও আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই।

*** একটা কথা সোজাসুজি বললে অনেক সময় ভালো লাগে না। পছন্দ হয় না। গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তেমনি উপদেশও সরাসরি শুনতে ভালো লাগে না। হজম হয় না। তাই জীবনঘনিষ্ঠ অনেক উপদেশ-নীতিকথাকে আমরা গল্পের মোড়কে সামনে আনার চেষ্টা করেছি।

*** গল্পগুলো পড়ে অনেকেই সাথে সাথেই প্রশ্ন করে বসে:

– ভাই! এগুলো কি সত্যি ঘটনা নাকি আপনার বানানো?

– কেন, আপনার কী মনে হয়?

– আমার কাছে তো সত্যিই মনে হয়েছে।

– আপনার কাছে সত্যি মনে হলে, সত্য বলেই ধরে নিন। তাহলেই ঝামেলা চুকে যায়।

*** আমাদের 'জীবন জাগার গল্প' ধারাক্রমের গল্পগুলো নিয়ে পাঠকরা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়। আমরা তাদের মন্তব্যগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার চেষ্টা করি। কোনও পাঠকের প্রতিক্রিয়া উৎসাহব্যঞ্জক। কোনও পাঠকের প্রতিক্রিয়া নিরুৎসাহব্যঞ্জক। কোনও পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় থাকে উত্তাপ। কোনও পাঠকের প্রতিক্রিয়া হয় নিরুত্তাপ।

*** প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক, আমরা সবগুলোকেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করার চেষ্টা করি। তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করি। আমাদের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। সামনে যাতে ভুলের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারি, সে চেষ্টা করি। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফীকদাতা।

*** একজন প্রশ্ন করলো:

– হুযুর হয়ে গল্প লিখেন কেন?

– কেন গল্প লিখলে কি কোনও সমস্যা আছে?

– না বলছিলাম কি, হুযুর মানুষ ওয়াজ-নসীহত করবে। তারা গল্প লিখছে দেখে কেমন যেন লাগে!

= এই ভাইকে কী উত্তর দেই?

*** এক ভাই ইনবক্সে মেসেজ পাঠিয়ে লিখলেন:

– আপনার গল্পটা আমার আব্বুকে পড়িয়েছিলাম। আগে তিনি আমাদের প্রতি যেমন আচরণ করতেন, এখনকার আচরণ তার চেয়ে ভিন্ন। আপনার প্রতি আমাদের ভাইবোনদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।

*** একভাই মেসেজ পাঠিয়ে লিখলেন:

– আপনি এসব বাজে গল্প কেন লিখতে শুরু করলেন? তার চেয়ে বরং এসব বাদ দিয়ে, কুরআন-হাদীসের কথা লিখুন। জাতি আপনার জন্যে দু'আ করবে। তারা কিছু শিখতে পারবে।

*** প্রশংসায় গলেও যেতে নেই আবার সমালোচনায় হতাশ হতেও নেই। দু'টো থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করাটাই হলো আসল।

= আসলে জীবনটা তো ব্যালান্স ঠিক রাখার নাম। একদিকে ঝুঁকে পড়লেই ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিপদের আশংকা দেখা দেয়। জীবনে আসে ছন্দপতন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

সূচী পত্র

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম

জীবন জাগার গল্প : ২৫৯

কুরআনের বান্ধবী

ড. রাফআত রিশান। লেবানিজ ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে কর্মরত দাম্মামে। সৌদি আরবে। তিনি বলেছেন- আমি দশ বছর যাবত এখানে কর্মরত। আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রথমে একটা পুত্রসন্তান দান করেছেন। আহমাদ। তার আট বছর পরে আল্লাহর অশেষ করুণা। তিনি আমাদেরকে দান করেছেন একটা ফুটফুটে কন্যা। ইয়াসমীন।

আমাদের ইয়াসমীন ছিলো সাক্ষাৎ আল্লাহর খাস রহমতপ্রাপ্তা। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন নিজ হাতে সাজিয়েছেন। সৌন্দর্যে, আদব-লেহাযে, লেখাপড়ায়, বাড়ির কাজকর্মে, কোন দিক দিয়ে সে পিছিয়ে ছিলো না। মাত্র নয় বছর হলে কী হবে, সে অতটুকুন বয়েস থেকেই হিজাব পড়া শুরু করে দিয়েছিলো। সে তার দাদুর কাছ থেকেই ধার্মিকতা, তাকওয়া, সালাত ও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা পেয়েছিলো।

ওর জন্মের পর তার মা অসুস্থ থাকার কারণে, সে দাদীর কাছেই মানুষ হয়েছে। দাদীও তার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি, ছোট্ট ইয়াসমীনের কাছে খুলে ধরতেন। তার শেষ বয়েসের আন্তরিক ইবাদতে-বন্দেগির সময় আদরের নাতনিকেও সঙ্গী বানিয়ে নিতেন।

দাদীর আর কোনও কথা বলার সঙ্গী না থাকাতে, একদিক দিয়ে ইয়াসমীনের জন্য ভালোই হয়েছে। দাদী আর কী-ইবা বলবেন। তিনি সবসময় নবী-রাসূলগণের জীবনী। লেবাননের ধর্মীয় আচার-আচরণ। ফিলাস্তীনের সংগ্রাম-সাধনা, ইসরাঈলের নির্যাতন ইত্যাদির গল্পই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, আমার আব্বু ছিলেন লেবানিজ। কিন্তু আম্মু হলেন ফিলিস্তীনি। তাই সব সময়ই, আমরা ভাই-বোনেরা, আম্মুর ঈমানদীপ্ত কথাবার্তা শুনে এসেছি। সাহসিকতা আর বীরত্বের গাঁথা জেনে এসেছি। বাইতুল মাকদিসকে রক্ষার জন্য জীবনদানের প্রেরণা নিয়ে বড় হয়েছি।

আমাদের ইয়াসমীনও এভাবেই বেড়ে উঠছিলো। স্কুলের পড়া মুখস্থ হয়ে গেলেই সে কুরআন নিয়ে বসে যেতো। দাদীর কাছ থেকেই কুরআনে হাফেয হওয়ার প্রেরণা লাভ করেছে সে। তারও প্রবল ইচ্ছা, সে দাদীজানের মতো কুরআনে হাফেয হবে। ইয়াসমীনের কুরআন পড়া ছিলো খুবই হৃদয়গ্রাহী। মনকাড়া।

দাদীর মতো ফিলিস্তীনি ঢঙে সে কুরআন তিলাওয়াত করতো। বড়ো মনোহর সে তিলাওয়াত। আমি ইয়াসমীনের মাঝে আমার জান্নাতবাসী মায়ের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম। ছেলেবেলায় আপন মায়ের বিশেষ রীতির কুরআন তিলাওয়াত শুনে সকালে ঘুম ভাঙতো। এখন বড় বেলায় আমার ছোট্ট মায়ের অনুপম কুরআন তিলাওয়াত শুনে দিনটা শুরু হয়। তার কুরআন শুনে, এমন কন্যালাভের সৌভাগ্যে চোখে পানি আসতো। আমার ছোট্ট মা-টার মাঝে আপন মায়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখে, মরহুম মায়ের জন্যে উথলে ওঠা শোকের তাড়নায় দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। আনন্দ-বেদনার অশ্রু একসাথেই গণ্ড বেয়ে ঝরতো।

আমার ছোট্ট মা-টা যখন নয় বছরে পা দিলো, সে একরাতে বললো তার পেট ব্যাথা করছে। প্রথমটায় আমি আর তার মা অতটা গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ইয়াসমীন ব্যাথায় রীতিমতো ছটফট করতে শুরু করলো। আহমাদ এসে বললো, ইয়াসমীন কেমন যেন করছে। আমি আর ওদের মা দৌড়ে গেলাম। মেয়ের অবস্থা খুব বেশি সুবিধের মনে হলো না। ওকে ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম। কর্তব্যরত ডাক্তার ব্যাথা নিরোধক ওষুধ দিলেন। ওষুধ খেয়ে ব্যাথা প্রশমিত হলো। ক'দিন পর আবার ব্যাথা উঠলো। ডাক্তার আবার ওষুধ দিয়ে ব্যাথা দমিয়ে দিলেন। এভাবে দুচারদিন পরপরই ইয়াসমীনের ব্যাথা উঠতো, আর ওষুধ খেলে ব্যাথাটা চলে যেতো। আমরা ভাবলাম, বিষয়টা সাময়িক। এক সময় কেটে যাবে। আমরা আর বিষয়টা নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিলাম না।

ইয়াসমীন কেন যেন, আগের চেয়ে কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো। লেখাপড়ার বাইরে আগে সামান্য যাও খেলাধুলা করতো, এখন তাও বন্ধ। জোর করে খেলতে পাঠালে, কিছুক্ষণ পর সে নিজ থেকেই চলে আসতো। এসে কুরআন হিফযে লেগে যেতো। যেন কোন তাড়া আছে। বান্ধবীদের সাথে খেলতে পাঠাতে চাইলে সে বলতোঃ

– কুরআনই আমার বন্ধু। আমি কুরআনের বান্ধবী। আমার কাছে কুরআনের সাথে থাকতেই ভালো লাগে। আমি দাদীজানের মতো হাফেযে কুরআন হতে চাই। দাদী আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, যেন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিফয শেষ করে ফেলি।

এরই মধ্যে, আমাদের কোম্পানীর একটা শাখা খোলা হলো নিউইয়র্কে। আমাকে সপরিবারে সেখানে পোস্টিং দেয়া হলো। অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে আমি আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করলাম।

আমেরিকা আসার প্রায় দুই মাস পর, ইয়াসমীনের পেটব্যাথাটা আবার উঠলো। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। এক সপ্তাহ পরে গিয়ে রিপোর্ট নিতে বললেন। আসার সময়, ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

- চিন্তার কোন কারণ নেই। তার কথা আমাকে অনেকটাই আশ্বস্ত করলো।

আমরা অবকাশ যাপনের জন্য ফ্লোরিডার ওরল্যান্ড শহরে গেলাম। সেখানে কয়টা দিন খুবই আনন্দে কাটলো। ইয়াসমীনও খুবই আনন্দিত হলো। পুরো সময়টাতেই সে বেশ চনমনে ছিলো। রোগের কোন আলামতই তার মধ্যে ছিলো না। আমি ডাক্তারের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম।

এমন সময় একদিন অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন এলো। আমি অবাক হলাম, আমি তো কাউকে নাম্বার দিইনি। এদেশে এলাম মাত্র কয়েকদিন হলো। এরই মধ্যে কে আমার নাম্বার পাবে? দ্বিধা নিয়েই ফোনটা ধরলাম।

- হ্যালো! কে?

- আমি ডা. স্টিফেন। আপনার মেয়ে ইয়াসমীনের ডাক্তার। আপনার সাথে আগামী কাল দেখা হওয়া সম্ভব?

- কেন, কোন সমস্যা? রিপোর্টে কি খারাপ কিছু এসেছে?

- সত্যি কথা বলতে কী, হ্যাঁ। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি ইয়াসমীনকে একটু দেখতে চাচ্ছি। আমার কিছু প্রশ্ন ছিলো।

- ঠিক আছে, আমি আগামী কাল বিকেল পাঁচটায় চেম্বারে আসবো।

আমি ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ঠিক কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের ওরল্যান্ড ভ্রমণের আরো দুদিনের প্রোগামসূচী বাকি

রয়ে গেছে। ইয়াসমীনের সময়টা খুবই আনন্দে কাটছে। এই প্রথম সে কোথাও বেড়াতে বের হয়েছে। কিভাবে যে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার কথা বলবো, ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষে বললাম:

- জরুরী একটা কাজে আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে। পরে ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগ করে আবার বেড়াতে আসবো।

পরদিন ইয়াসমীনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি ইয়াসমীনকে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমাকে আলাদা কামরায় ডেকে নিয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন:

- ইয়াসমীন কখন থেকে অসুস্থ?

- প্রায় এক বছর যাবত।

- আগে তার কী চিকিৎসা হয়েছিলো?

- চিকিৎসা বলতে, তাকে ব্যাথা নিরোধক ওষুধ দেয়া হয়েছিলো।

- কিন্তু সেটা সঠিক ওষুধ ছিলো না। তার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। এটা একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে। সে বড়জোর ছয়মাস বাঁচবে। বড় বড় ডাক্তাররা বোর্ড বসিয়ে রিপোর্ট দেখেছে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগলাম। বিশ্বাসই হতে চাইছিলো না, এমন অবুঝ একটা মেয়ে এভাবে চলে যাবে। আমি বজ্রাহতের মত বসে রইলাম। ডাক্তার আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। বাস্তবতা মেনে নিতে বললেন।

এমন ফুটফুটে গোলাব অকালেই ঝরে যাবে? সুবাস ছড়াবার আগেই ফুলটা শুকিয়ে যাবে? মেয়েকে বুঝতে দিলাম না। মনে পাথর বেঁধে বাড়ি এলাম। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, বেলকনিতে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণচিত্তে ভাবছিলাম। আমার অজান্তেই শরীর ভেঙে কান্না এলো। আমাকে বিছানায় না দেখে রুকাইয়া উঠে এলো। কান্না দেখে কিছু একটা হয়তো তার মনে উদয় হয়ে থাকবে। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো:

- ইয়াসমীনের কি খারাপ কিছু হয়েছে?

আমি তাকে বিষয়টা খুলে বললাম। মেয়ের এই সংবাদ দুঃখিনী মা শুনে সহ্য করতে পারলো না। বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো।

আওয়াজ শুনে আহমাদ ছুটে এলো। সেও খবরটা জেনে গেলো। আহমাদ খবরটা শুনেই চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। দৌড়ে গিয়ে ইয়াসমীনকে জড়িয়ে ধরলো। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

বেচারি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘুম থেকে জেগে গেলো।

আহমাদকে নিষেধ করার আগেই সে বলে ফেললোঃ

- বোন তুমি মারা যেতে পারবে না। তুমি মারা যেতে পারো না।

আমি তাদের মাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। খবরটা লুকোতে চাইলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফাঁস হয়ে গেলো।

আহমাদ ইয়াসমীনকে ধরে অঝোরে কেঁদেই চলছে। বেচারি ইয়াসমীন কিছুই বুঝতে পারছে না। আহমাদ বললোঃ

- বোন! তুমি কিছুতেই মরতে পারবে না।

ইয়াসমীন বললোঃ

-আমি মারা যাবো? কী মারা যাবো? সে বুঝতে পারছিলো না, মৃত্যু কী। কাকে বলে মৃত্যু। দাদীর মৃত্যু দেখেছে কিন্তু এখনো এর অর্থটা ভালোভাবে বোঝা হয়ে ওঠেনি।

আমি গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। তাকে বললামঃ

- তুমি কিছুদিন পর আল্লাহর কাছে বেড়াতে যাবে।

- আমি আল্লাহর কাছে বেড়াতে যাবো? সেটা তো খুবই ভালো হবে। দাদু বলতেনঃ

- আল্লাহ সবার চেয়ে ভালো। বাবা-মার চেয়ে ভালো। দুনিয়ার সবার চেয়ে ভালো।

- আব্বু! আমি আল্লাহর কাছে বেড়াতে গেলে সেটা তো ভালোই হবে। আপনি কাঁদছেন কেন?।

মেয়ের নিষ্পাপ প্রশ্ন আমার বুকে শেলের মতো বিঁধলো। তাকে বললামঃ

- আনন্দে কাঁদছি রে মা!।

পরদিন আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার তারিখ ছিলো। ডাক্তার বললেনঃ

- এখন তার বাকি দিনগুলো যতটা সম্ভব সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা দরকার।

কিছুদিন যাওয়ার পর, ইয়াসমীন কিছুটা যেন বুঝতে পারলো। তার মৃত্যু হবে। দাদুর মতো সেও আর ফিরে আসবে না। তখন সে চিকিৎসা করাতে বেঁকে বসলো। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলো, যখন চলেই যাবো, তাহলে শুধু শুধু চিকিৎসা কেন? ডাক্তার তাকে বোঝালেনঃ

- ইয়াসমীন! আমরা যারা সুস্থ আছি, তারাও একদিন মারা যাবো। এটা নিশ্চিত। তার মানে কি এটা যে আমার খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে দেবো? চিকিৎসা বাদ দিয়ে দেবো? হাসি-আনন্দ বাদ দিয়ে দেবো? ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দেবো? এমন হলে তো গোটা দুনিয়াটাই থমকে দাঁড়াবে। বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে সমাজ। পৃথিবীতে কোনও প্রাণী থাকবে না।

ডাক্তার আরো বললেন:

- শোনো ইয়াসমীন! প্রতিটি মানুষের শরীরে অনেকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। কলকব্জা আছে। মেশিন-যন্ত্র আছে। এগুলো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমত। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে গচ্ছিত আমানত।

ধরা যাক, তোমাকে তোমার একজন বান্ধবী একটা খেলনা আমানত হিসেবে রাখতে দিলো। তুমি কি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে হিফাযত করবে, নাকি ভেঙে ফেলবে?

- জীবন দিয়ে হলেও হিফাযত করবো। ইনশাআল্লাহ।

- তেমনি অবস্থা হলো তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। এগুলো যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, তাই এগুলোকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, এগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার দায়িত্ব। আর তুমি ওষুধ খাবে বা চিকিৎসা গ্রহণ করবে, সেটা হবে দুটো উদ্দেশ্যে:

এক: রোগের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য।

দুই: তোমার সাধ্যানুযায়ী শরীরটাকে রক্ষা করার জন্য।

যাতে তুমি যখন তোমার সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তুমি বলতে পারো:

- ইয়া রাব্বি! আমি আপনার দেয়া আমানত রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছি। আপনি আমাকে সেগুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছি। এই নিন, আপনার আমানত আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার অনিচ্ছায় শরীরের যা কিছু নষ্ট হয়েছে, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

ইয়াসমীন এত ভারি কথা বুঝলো কিনা কী জানি। ডাক্তারের বোঝানোর পর সে আর আপত্তি করলো না। সে বললো:

- বিষয়টা যদি এমনই হয়, তাহলে চিকিৎসা গ্রহণে আমার কোনও আপত্তি নেই।

খুব দ্রুতই ছয়মাস কেটে গেলো। যতই দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো, তার শরীরটা শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে যেতে লাগলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তার চেহারাটা শরীরের বিপরীত। শরীর যতই শুকোতে লাগলো, চেহারা ততই উজ্জল আর সুন্দর হতে লাগলো।

আমি আর তার মা রুকাইয়া, মেয়ের চিন্তায় পাগলপারা হওয়ার যোগাড়। রুকাইয়াকে তো বোঝানোই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। মেয়ের দেখাশোনা করবো কি, স্ত্রীকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি শুরু হয়ে গেলো।

ইয়াসমীন সারাক্ষণই কুরআন তিলাওয়াতে লেগে থাকলো। বেশি বেশি মুখস্থ করতে থাকলো। তাকে প্রশ্ন করলাম:

- তুমি কেন কুরআন মুখস্থ করছো?

- দাদু বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে ভালোবাসেন। যারা কুরআন হিফয করে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবো:

- ইয়া রাব্বি! আমি কুরআন কারীমের কিছু অংশ মুখস্থ করেছি। কেননা, যারা কুরআন হিফয করে তাদেরকে আপনি ভালোবাসেন।

ইয়াসমীন শেষের দিকে, নামাযও বেশি বেশি পড়তে শুরু করেছিলো। তার মা তাকে, ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায এত কষ্ট করে পড়তে নিষেধ করতো। সে বলতো:

- দাদু আমাকে বলেছিলেন, নবীজির (সা.) হাদীসে আছে:

"নামাযের মধ্যেই আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে"।

- আমিও চেষ্টা করছি, যাতে নামাযটা আমারও চক্ষুর শীতলতার কারণ হয়।

দিন ঘনিয়ে আসছিলো। শেষের দিকে সে সারাক্ষণই সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করতো। একদিন সকাল বেলা, তার খুব শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। এত কষ্টের মধ্যেও সে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করলো। সূরা ফাতিহা আর সূরা ইখলাস পড়লো। আয়াতুল কুরসি পড়লো। তার চোখ দুটো বুজে এলো। বিড়বিড় করে বললো:

- আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন হিফয করার তাওফীক দিয়েছেন। কিছুদিন নামায পড়ার শক্তি দিয়েছেন। মুমিন আর ধৈর্যশীল আম্মু-আব্বু দান করেছেন। আমি তার শুকরিয়া আদায়

করছি, তিনি আমাকে কাফির হিসেবে দুনিয়াতে পাঠান নি। তার অবাধ্য হিসেবেও পাঠান নি। তারপর ইয়াসমীন বড়োই অদ্ভুত কথা বললো। সে বললো:

- আম্মু! আব্বু আর আহমাদকে নিয়ে আপনি বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

- কেন, মা-মণি? কী হয়েছে?

- আমি দেখতে পাচ্ছি, এই কামরার ছাদটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর কিছু মানুষ দেখা যাচ্ছে। তাদের পুরো শরীর খুবই উজ্জ্বল। তারা আপনার মতোই খুব মিষ্টি করে হাসছে। তাদের গায়ে সাদা আর নীল পোশাক। তারা আমার দিকে আসছে। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের সাথে যাওয়ার জন্য বলছে।

মা কান্নায় ভেঙে পড়লো। আর ইয়াসমীনের কথাও বন্ধ হয়ে গেলো। চোখ দুটোও বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু তার ঠোঁট দুটোতে লেগে ছিলো মিষ্টি একটা হাসি।

জীবন জাগার গল্প : ২৬০

গ্রুপ-স্টাডি

পুরো ইশকুলে অনেক দুর্বল ছাত্র। পরীক্ষায় পাশের হার খুবই নগণ্য। শিক্ষকরা সবাই মিলে ঠিক করলেন ইশকুলে গ্রুপ-স্টাডি চালু করতে হবে। গ্রুপ-স্টাডির ব্যবস্থা থাকলে দুর্বলরা সবল হয়ে উঠবে, সবলরা আরো প্রবল হবে। পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হবে।

প্রধান শিক্ষক প্রতিটি ক্লাশের সব ছাত্রকে পাঁচ জন করে-করে দল গঠন করে দিলেন। এদেরকে বলা হলো লেখাপড়ার পুরো বিষয়টা একসাথে বসে করতে। কিন্তু দলগুলো টিকলো না। কয়েকদিন পর দেখা গেলো, ভালো ছাত্ররা দলছুট হয়ে একা একা পড়াশুনা করছে। দুর্বলদের প্রতি কোন লক্ষ্যই রাখছে না।

প্রধান শিক্ষক একদিন সবাইকে নিয়ে বসলেন। তিনি প্রথমেই একটা গল্প দিয়ে শুরু করলেন:

- জেলা পর্যায়ের বার্ষিক কৃষি উৎসবে একজন কৃষক প্রতি বছরই শ্রেষ্ঠ কৃষকের পুরস্কার পায়। সবাই অবাক হয়, তার এই সাফল্যের রহস্য কী? সবাই তাকে ছেঁকে ধরলো। কৃষক বললো:

- আমি প্রতি বছর চাষের মওসুম আসার আগে, খুঁজে খুঁজে ফসলের সেরা বীজগুলো সংগ্রহ করে রাখি। আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করেই সংগ্রহ করি।

- অতিরিক্ত বীজগুলো কী করেন?

- সেগুলো আমার আশেপাশে যাদের জমি আছে তাদেরকে দিয়ে দেই। তাদের উৎসাহ দেই যেন তারা এই উন্নত জাতের বীজগুলো তাদের জমিতে ফেলে।

- এতে আপনার লাভ কী?

- এতে আমার পুরোটাই লাভ। প্রথমতঃ বীজের টাকা তো আমি তাদের থেকে কিছু লাভসহ নিয়ে নিই। আর পরোপকারের বিষয়টাতো থাকছেই। সবচেয়ে বড় আরেকটা উপকার হয়।

- সেটা কী?

- পরাগায়ন সুবিধা।

- বুঝতে পারলাম না।

- ফসলে যখন ফুল বা বোল আসে, তখন বাতাস এক গাছের পরাগরেণু আরেক গাছে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারাও এ পরাগায়নের কাজটা হয়। আমার আশেপাশের জমিতে যদি খারাপ বীজ ফেলা হয়, বাতাস তো আমার ফসলে সেই খারাপ বীজের পরাগ উড়িয়ে আনবে। তখন আমার সেরা বীজ একা একা কোন কাজে আসবে না।

আমি নিজের স্বার্থেই সবাইকে সেরা বীজ বিতরণ করি।

প্রধান শিক্ষক এবার আলোচনা স্কুলে টেনে এনে বললেন:

- তোমরা এই বুদ্ধিমান কৃষকের মতো হওয়ার চেষ্টা করো। কৃষক নিজের স্বার্থেই অন্যকে ভালো জাতের বীজ বিতরণ করেছে। তুমিও তোমার সাথীকে লেখাপড়ায় সাহায্য করো। প্রতিযোগিতা ছাড়া যোগ্যতা বাড়ে না। তোমার বন্ধু যদি যোগ্যতাহীন হয়, তাহলে তুমি কার সাথে প্রতিযোগিতা করবে? দুর্বলের সাথে প্রতিযোগিতা করে এখানে না হয় জিতলে, কিন্তু জীবনযুদ্ধের ময়দানে কি তোমার প্রতিপক্ষ দুর্বল থাকবে? তাই বাবারা! স্কুলের স্বার্থে না হলেও অন্তত নিজের স্বার্থে তোমরা যারা ভালো ছাত্র আছো, তারা দুর্বলদেরকে সাহায্য করো। তাদেরকেও এগিয়ে আসতে দাও।

মনে রাখবে বাবারা! তুমি তাকে টেনে তুললে, তুমিও কিন্তু এগিয়ে গেলে।

জীবন জাগার গল্প : ২৬১

পাহাড়সম ইচ্ছাশক্তি

বলা হয়, একজন মানুষ যদি ইচ্ছা করে, সে বিরাট একটা পাহাড়কে জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলবে, সেটা সম্ভব।

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিলো আর্মেনিয়ায়। ১৯৮৯ সালে। এই বছর স্মরণকালের ভয়াবহতম ভূমিকম্প আঘাত হানে আর্মেনিয়ায়। প্রায় মুহূর্তের মধ্যে পঁচিশ হাজার মানুষ মারা যায়। পুরো একটা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। উপদ্রুত এলাকায় একটা ঘরও অক্ষত থাকলো না। এই বিরান শহরের একজন অধিবাসী হলো মেরিনো। পেশায় আখ ব্যবসায়ী।

বেলা বারটায় যখন ভূমিকম্প হলো তখন মেরিনো ছিলো আখ ক্ষেতে। স্ত্রী ইসাবেলাও সাথে ছিলো। মুহূর্তের প্রকম্পনে পুরো এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। বাচ্চারা সবাই স্কুলে। পুরো এলাকার লোকজন নিজেদের ঘরবাড়ি রেখে স্কুলের দিকে ছুটলো। স্কুলঘরটা ছিলো কয়েক তলাবিশিষ্ট।

মেরিনো দৌড়াচ্ছে আর ভাবছে :

- এই সকালেও বাচ্চাকে প্রতিদিনের মতো স্কুলে দিয়ে এসেছে। আসার সময় সান্ত্বনা দিয়ে বলে এসেছে

- তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি সব সময় তোমার সাথেই আছি। বিকেলে ছুটি হলেই আমাকে দেখতে পাবে।

মেরিনো স্কুল চত্বরে গিয়ে দেখলো সব শেষ। পুরো স্কুলঘরটা ধ্বসে পড়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এই অবস্থাতেই বিদ্যুচ্চমকের মতো তার মনে পড়লো, সে সকালে ছেলেকে বলে গেছেঃ

-তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি সব সময় তোমার সাথেই আছি।

মেরিনো তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। কোত্থেকে যেন দানবীয় শক্তি এসে তার শরীরে ভর করলো। চোখের অশ্রু মুছে স্কুলের প্রাইমারি সেকশনের দিকে এগিয়ে গেলো। থমকে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো, ছেলের ক্লাশরুমটা কোথায়? অনুমানের উপর ভিত্তি করে, ভগ্নস্তুপ সরাতে আরম্ভ করে দিলো।

মেরিনোর খেপাটে আচরণ দেখে, স্কুল মাঠে দাঁড়ানো দুইজন শোকাহত পিতা কাছে এসে বললোঃ

- তুমি অযথাই কষ্ট করছো। ভেতরে কেউ বেঁচে নেই। সবাই মরে গেছে।

মেরিনো তাদের দিকে ফিরে বললোঃ

- তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। একটু পরে পুলিশ এলো । তারা ভাবলো মেরিনো অতি শোকে পাগল হয়ে গেছে। তারাও তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু মেরিনোকে টলানো গেলো না।

ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এলো। তারা হুমকি-ধমকি দিয়ে বললোঃ

- তুমি এসব করে ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তুলছো।

মেরিনো তাদের দিকে ফিরে বললোঃ

- তোমরা হয় আমাকে সাহায্য করো, না হয় আমার সামনে থেকে সরে যাও। কাজে বাধা সৃষ্টি করো না।

মেরিনো হাত থেকে শুরু করে পুরো শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তার উপর যেন অন্য কিছু ভর করেছে। সে একটা ঘোরের মধ্যেই তার কাজ চালিয়ে গেলো। এভাবে সে অমানুষিক-অতিমানবীয় কাজ একটানা সাঁইত্রিশ (৩৭) ঘণ্টা চালিয়ে গেলো।

ভাঙা ছাদের বড় চাঁই সরানোর পর বড়সড় একটা ফোকর বের হলো। মাথাটা সেই ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। জোরে হাঁক দিলোঃ

- আরমান্দো! আরমান্দো! শুনতো পাচ্ছো?

অনেক দূর থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ শোনা গেলোঃ

- বাবা! এই যে আমরা এখানে।

মেরিনো ফাটলটা আরো বড় করে ভেতরে ঢুকলো। আরমান্দো বাবার গলায় ঝুলে পড়লো। অসম্ভব দুর্বল গলায় বললোঃ

- জানো আব্বু! আমি আমার বন্ধুদেরকে বলেছি, পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমার আব্বু ঠিকই আসবেন। আমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় নি।

মেরিনো ছেলেকে কোলে নিয়েই অচেতন হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো।

চৌদ্দজন ছাত্রকে মৃত উদ্ধার করা হলো। আর তেত্রিশজন ছাত্রকে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। তাদের মধ্যে আরমান্দোও আছে। মেরিনোকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কয়েক সপ্তাহ একটানা চিকিৎসার পর মেরিনো হাঁটাচলা করার উপযোগী হলো।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সাংবাদিক জিওপ্রে ব্যাটন ছুটে গেলো আর্মেনিয়ায়। মেরিনোকে প্রশ্ন করলো:

- আপনি এই অসাধ্য কিভাবে সাধন করলেন?

- কারণ আমি আমার আরমান্দোকে কথা দিয়েছিলাম:

- পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমি সব সময় তোমার পাশেই থাকবো।

জীবন জাগার গল্প : ২৬২

ব্যাঙ ও মানুষ

রুহমা। একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র। সমস্ত রুগিকে একটা বড় হল ঘরে জড়ো করা হয়েছে। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ভেতরে প্রবেশ করলেন। তার পেছন পেছন এলো একজন। তার হাতে একটা সসপ্যান, একটা গ্যাসের স্টোভ, আর প্লাস্টিকের প্যাকেটে জীবন্ত একটা ব্যাঙ।

অধ্যাপক সালামকে বিচিত্র সব সরঞ্জাম নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করতে দেখে, সবার ঢুলুঢুলু চোখ সচকিত হলো। নেশালু দৃষ্টিতে প্রখরতা এলো।

অধ্যাপক সালাম সবাইকে তার দিকে তাকাতে বললেন।

- সবাই একটু আমার দিকে তাকান। আমি কী করি সেটা একটু গভীর মনযোগের সাথে দেখুন।

তিনি স্টোভ জ্বালিয়ে সসপ্যানটা চাপিয়ে দিলেন। সসপ্যানটা পানি দিয়ে ভর্তি করলেন। এইবার ব্যাঙটাকে পানিতে ছেড়ে দিলেন। পানি আস্তে আস্তে গরম হতে লাগলো। ব্যাঙটা চুপচাপ পানিতে বসে রইলো। পানি আরো গরম হলো, ব্যাঙটা তখনো বসে রইলো। এক সময় পানিটা ফুটতে শুরু করলো। এবার ব্যাঙ সামান্য নড়াচড়া করে মরে গেলো।

অধ্যাপক সালাম এবার শ্রোতাদের দিকে ফিরলেন। বললেন:

- একটা ব্যাঙকে যখন গরম পানিতে রাখা হয়, সেটা পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজের শরীরের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি করতে থাকে। এভাবেই

ব্যাঙটা পানির তাপের সাথে শরীরের তাপমাত্রার সামঞ্জস্য বজায় রাখে। কিন্তু যখন পানি ফুটে উঠার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আর পানির তাপমাত্রার সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।

তখন পানির গরমে টিকতে না পেরে, লাফিয়ে বাইরে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না। কারণ পানির তাপমাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য ব্যাঙটা আগেই সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে।

- এখন আপনারা বলুন, ব্যাঙটা কেন মারা গেলো?

- গরমে টিকতে না পেরে স্যার।

- না, উত্তর সঠিক হয়নি। ব্যাঙটা মারা গিয়েছে, সে কখন লাফ দিয়ে বের হয়ে আসবে, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্তে আসতে না পারার কারণে।

আপনারাও দেখুন:

- প্রচণ্ড শক্তিশালী মাদকও অনেককে ব্যাঙের মতো করে ফেলে। মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে রয়েছে, অসাধারণ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা। শুরুতে মাদকাসক্তরা বুঝে উঠতেই পারে না, মাদকের ভয়াবহতা কী? তারা ভাবে সবকিছু ঠিক রেখে মাদক নেয়া অব্যাহত রাখতে পারবে। কিন্তু একটা পর্যায়ে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ততদিনে মাদক তাকে শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে। এই আসক্তির ভয়াল দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার শক্তি ততদিনে সে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তাদের পরিণতিও হয় ব্যাঙের মতোই।

এখন ভাইয়েরা! আপনারা কি একটা ব্যাঙের মতো মরতে চান, নাকি একজন মানুষের মতো বাঁচতে চান?

-আমরা একজন মানুষের মতো বাঁচতে চাই।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৩

মায়ের তত্ত্বাবধান

বেন কারসন। আমেরিকার সুবিখ্যাত সার্জন। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন:

- আমার আম্মা ছিলেন একজন গৃহপরিচারিকা। মানুষের ঘরে ঝিয়ের কাজ করতেন। লিখতেও পারতেন না, পড়তেও না।

তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ঘরে যেহেতু লেখাপড়ার চাপ ছিলো না, তাই আমি স্কুলে আসা-যাওয়া করেই খালাস। এজন্য ফলাফল খারাপ হতে শুরু করলো। স্কুল থেকে আম্মুকে ডেকে পাঠানো হলো। তাকে বলা হলো:

- আপনার ছেলে স্কুলের সবচেয়ে মেধাহীন আর পিছিয়ে পড়া ছাত্র। আর একটা পরীক্ষায় যদি সে খারাপ করে তাহলে তাকে নীচের গ্রেডে নামিয়ে দিতে বাধ্য হবো।

ডা. বেন বলেন- আম্মু আমার অবস্থার কথা জানতে পেরে নির্বাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না, তার এত কষ্টের টাকা এভাবে বৃথা যাবে। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বললেন না।

বাড়ি এসে তিনি একটা কাজ করলেন। পরদিন তিনি কমিউনিটি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে এক সপ্তাহের জন্য দুটি বই নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন:

- এই বই দুটো ভালোভাবে পড়ে একটা সারাংশ লিখ। আমি দেখবো। স্কুলে আপাতত যেতে হবে না।

আমি সারাদিন-রাত বসে বসে এই করতে থাকলাম। আমি তখনো জানতাম না যে আম্মু লেখাপড়া জানেন না। কোথাও যাতে কোনও ভুল না থাকে সেজন্য খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজটা করতাম। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর, আমি লেখা ও পড়া উভয়টাতেই বেশ দক্ষ হয়ে গেলাম। আম্মু ভয় দেখাতেন:

- ভালোভাবে না পড়লে বিকেলে বাস্কেটবল কোর্টে যেতে দেবো না। সাইকেল চালাতে দেবো না।

আমি খেলার লোভেই সব সময় পড়ালেখাটা ঠিকমতো করে গেলাম। এবার আম্মু আমাকে আবার স্কুলে নিয়ে গেলেন। এরপর আর আমাকে পিছনে তাকাতে হয় নি।

আমি স্কুলের সবচেয়ে নির্বোধ ছাত্র থেকে সুবোধ ছাত্রে পরিণত হলাম। ব্যর্থতার অতল গহ্বর থেকে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হলাম। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই বাল্টিমোর শিশু হাসপাতালের প্রধান সার্জনে পরিণত হয়েছি। আমার হাতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, সফল অপারেশানের মাধ্যমে, যুক্তমাথা নিয়ে জন্ম নেয়া দুইটি শিশুকে, সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আলাদা করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসা বিষয়ক আমার প্রায় নব্বইটারও বেশি লিখিত বই আছে। সবগুলোই বেস্ট সেলার।

● এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে আমার মায়ের নেয়া সেই পদক্ষেপের কারণে। আমার আম্মু নিরক্ষর হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন ভালোভাবে মনযোগ দিয়ে বুঝে বুঝে পড়া আর সেটা নিজের ভাষায় লিখতে পারাটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। এই যোগ্যতাটাই একজন ছাত্রের মৌলিক যোগ্যতা।

আম্মু আজ বেঁচে নেই। কিন্তু আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস তাকে স্মরণ করে। আমার প্রতিটি চোখের পলক তাকে দেখতে পায়।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৪

যুদ্ধজয়ের কৌশল

হারোকি মিশোকা। প্রাচীনকালের এক জাপানি রাজা। এক যুদ্ধবাজ রাজা। তার ছিলো অনন্যসাধারণ যুদ্ধজয়ের কৌশল। প্রতিপক্ষ যত বেশি সেনাবাহিনীর অধিকারীই হোক, রাজার কাছে পরাজিত হতো।

রাজা যুদ্ধ করতে পছন্দ করলেও তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। দেশের মানুষের জন্য তার অন্তর ছিলো সদা কোমল। এজন্য প্রজাদের কাছে রাজা ছিলেন চোখের মণি। রাজার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে তারা এক পায়ে খাড়া।

তা হলে কী হবে, রাজা যুদ্ধে যাওয়ার সময় খুব বেশি সৈন্য নেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি অল্পসৈন্য দিয়েই যুদ্ধ করতেন। দেখা গেছে শত্রুবাহিনীর অর্ধেকসংখ্যক সৈন্য নিয়েও রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

রাজা সব সময় বলতেন:

-যুদ্ধ হচ্ছে জয়লাভ করার জন্য। হারার জন্য নয়।

তার হাবভাব দেখে জয়লাভের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহই থাকতো না। রাজা প্রতিবারই যুদ্ধে যাওয়ার পথে, নিষ্ঠার সাথে একটা কাজ করতেন। দেশের সর্ববৃহৎ শিন্টো মন্দিরে যেতেন। একা একা। সাথে কাউকে নিতেন না। সৈন্যরা তখন সারিবদ্ধভাবে মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে থাকতো। রাজা মন্দির থেকে বের হয়ে আসার সময় হাতে একটা কয়েন থাকতো। তিনি সৈন্যদের সামনে ছোট্ট একটা বক্তব্য দিতেন। যতটা সম্ভব উৎসাহব্যাঞ্জক কথা শোনাতেন। তারপর বলতেন:

-এই যে কয়েন দেখতে পাচ্ছো, সেটা একটা মন্ত্রপূত কয়েন। সাক্ষাৎ দেবতার আশীর্বাদ ধন্য কয়েন। এখন আমি কয়েনটা ছুঁড়ে মারবো। যদি 'হেড' উঠে তাহলে দেবতার কথা অনুযায়ী আমরাই জয়লাভ করবো। আর যদি 'টেল' উঠে, তাহলে আমরা যুদ্ধ না করে ফিরে যাবো। কয়েন ছোঁড়ার পর দেখা যেতো প্রত্যেকবারই হেড উঠতো।

সৈন্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দেবতার আশীর্বাদ তাদের সাথে আছে। আর পরোয়া কি। এভাবে রাজা খুব সহজেই প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করে চললেন।

মানুষের জীবন তো অসীম নয়। এক সময় রাজা বার্ধক্যজনিত অসুখে মারা গেলেন। রাজার বড় ছেলে সিংহাসনে বসলো। বাবার পদাংক অনুসরণ করে যুদ্ধে বের হলো। যাওয়ার পথে শিন্টো মন্দিরে প্রবেশ করলো। মন্দিরের বেদীতে বাবার রেখে যাওয়া কয়েনটা দেখতে পেলেন। সাথে একটা কাগজের টুকরো। কয়েনটা নেড়েচেড়ে দেখে নতুন রাজা অবাক হলো। কয়েনটার উভয় দিকই 'হেড'। তার মানে কয়েনটা ছুঁড়ে দিয়ে সব সময় হেডই উঠবে, টেইল উঠবে না। টেইল থাকলে তো উঠবে!

তরুণ রাজা এবার কাগজটা খুলে পড়তে শুরু করলো, তাতে লেখা আছেঃ

-বাবা নারুহিতো! তুমি কখনোই এটা বিশ্বাস করো না যে, তুমি পরাজিত হবে। এমন চিন্তা তোমার মাথাতেই স্থান দিও না।

মনে রাখবে, তোমার সামনে সর্বদা দুইটা পথ খোলা আছেঃ

এক: যেভাবেই হোক তোমাকে চলমান যুদ্ধে জয়লাভ করতেই হবে।

দুইঃ পৃথিবীতে জয় ছাড়া আর কোনও কিছুই নেই। পরাজয় বলে কিচ্ছু নেই।

বৎস! তুমি এর বাইরে অন্য কোনও চিন্তা মাথায় একদম স্থান দিবে না। জয় তোমারই পদচুম্বন করবে।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৫

হ্যালো! এক্সকিউজ মি

বযমে কাওয়ালি শেষ হলো। কাওয়ালি সন্ধ্যার পর ট্রেন আপাতত নীরব। নিথর। এতক্ষণ নর্তন-কুর্দনের পর সবাই যেন ক্লান্ত-শ্রান্ত।

তবুও ঝালাপালা কানের পর্দায় থেকে থেকে রেশ আসছিলো:

- আঁআআআআ আঁল্লা আআআআ।

ট্রেন ভৈরব এলো। এমন সময় দেখলাম একজন হুযুর। ধোপদুরস্ত। ফিনফিনে আদ্দির, শান্তিপুরী ধুতির কাপড় দিয়ে সেলাই করা পাঞ্জাবি।

চোস্ত পোশাকাশাক। গা থেকে ভুরভুর সুবাস ছড়াচ্ছে। হাঁটাচলায় সেলিব্রেটি সেলিব্রেটি ভাব।

অনেকটা যেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরাক সফরে এসেছেন। সারি বেঁধে জেনারেলরা দাঁড়িয়ে আছে।

ওবামা একপাশ থেকে হ্যান্ডশেক করে আসছেন। আর বলছেন:

হাউ ডু ইউ ডু!

এই হুযুরকেও দেখলাম বগির ওপ্রান্ত থেকে দুপাশের আসনের যাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করছেন। আমি ভাবলাম কোনও এমপি বা এই ধরণের কিছু একটা হবেন।

তার আলাপচারিতার নমুনা দিলেই বোঝা যাবে:

-হ্যালো! এক্সকিউজ মি, কেমন আছেন। ভালো তো? কোথায় যাচ্ছেন ভাই? কোনও সমস্যা নেই তো?

-এই যে আপা, একটু সরে বসবেন কি? আপনার পাশের ছোট বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও একটু বসার সুযোগ দিন না।

আরে, মানুষ তো মানুষের জন্য।

-এই যে ভাই, পত্রিকা পড়ছেন বুঝি? কী পত্রিকা? পড়েন পড়েন।

-এই আপু! বাচ্চাটার কী নাম রেখেছেন?

কী বললেন সুমাইয়া?

আরে! এত সুন্দর নাম! জানেন সুমাইয়া কে?

এভাবে হুযুর পুরো বগি পরিক্রমা করলেন।

এবার তিনি বগির মাঝামাঝিতে এসে দাঁড়ালেন। নতুন করে কথা শুরু করলেন:

-আমরা এখন পার হচ্ছি ঐতিহাসিক ভৈরব জনপদ। এই জনপদেরই প্রত্যন্ত এক ছায়াঘেরা, শ্যামল ছায়াবেষ্টিত সোনালি গ্রামে, একটা ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা আছে। ....

এভাবে আরো কিছুক্ষণ পরিচিতিমূলক বক্তব্য দেয়ার পর তিনি পকেট থেকে রসিদবই বের করলেন।

আমি পর্যন্ত হুযুরের উপস্থাপনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে মুগ্ধ।

চারপাশে তাকিয়ে দেখি, কারো পকেটে হাত। আর কারো হাত ভ্যানিটি ব্যাগে।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৬

দুটি চিত্র

প্রথম চিত্র

জিলানি সাহেব একজন সরকারী কর্মকর্তা। সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন। চাকুরিজীবনের শুরুতেই মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনেও কখনো ঘুষ খাবেন না। মা বলেছিলেন:

- নেবু! তুই আমাকে কথা দে, জীবনে কখনো ঘুষ ছুঁয়েও দেখবি না।

- জ্বি, মা! কথা দিলাম।

জিলানি সাহেব অফিসে জয়েন করে দেখলেন, এখানে ঘুষ খাওয়া নয়, না খাওয়াটাই অনেক বড় অপরাধ। শুধু যে অপরাধ তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ না খেলে অন্য কলিগদের চরম রোষের শিকার হতে হয়। এমনকি পানিশমেন্ট পোস্টিং নিয়ে বান্দরবান বা সুন্দরবনে চলে যেতে হয়।

পাঁচ বছরের কর্মজীবনে আজ প্রথমবারের মতো ঘুষ নিলেন। এক বিধবার কাছ থেকে পনের হাজার টাকা নিলেন।

বিকেলে বাসায় ফিরে দেখেন, ছোট ছেলেটা সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে। মাস শেষ, পকেট খালি। কিন্তু সাথে ঘুষের পনের হাজার টাকা আছে। জিলানি সাহেব ভাবলেন:

-ভাগ্যিস! টাকাটা ছিলো, না হলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা খরচ যোগাতাম কোত্থেকে?

দ্বিতীয় চিত্র

সফদর সাহেব একজন পুলিস অফিসার। তিনি খুবই সৎ কর্মকর্তা হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছেন। শত চাপেও টলেন না। মাথা নোয়ান না। যত ভয়ংকর জায়গায় পোস্টিং-এর ভয়ই দেখানো হোক তিনি আপোস করেন না।

চাকুরি জীবনের প্রথমদিন সারদা পুলিশ একাডেমির প্রধান, তার গুরু, বিগ্রেডিয়ার শাহনেওয়াজের কাছে দু'আ চাইতে গিয়েছিলেন। গুরু শুধু একটা কথাই বলেছেন:

- সফদর!

- ইয়েস স্যার।

- তুমি চাইলে টাকার পাহাড় করে ফেলতে পারবে। আবার নেকির পাহাড়ও গড়তে পারবে। তুমিই বেছে নিও কোন পাহাড়টা তোমার পরকালে কাজে লাগবে।

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য মেনে সফদার সাহেব সৎভাবেই চাকরি জীবন শুরু করেছেন। গত পাঁচ বছর এ নীতি মেনেই চাকরি করে এসেছেন। কিন্তু গোল বেধেছে আজ। কোনও এক বড় আসামিকে কোর্ট থেকে পালানোর সহযোগিতা করার জন্য পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বিপুল অর্থ দেয়া হলো। তার ছিঁটেফোটা সফদর সাহেবের ভাগেও এসে পড়লো।

এ টাকা নেয়াও যায় না। আবার ফেলাও যায় না। তাহলে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। বাধ্য হয়ে টাকাটা নিতে হলো। ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় ঢুকেই শোনেন ছোট মেয়েটা বাথরূমে পিছল খেয়ে পড়ে, হাতের কনুই ভেঙে ফেলেছে।

সফদর সাহেব মনে মনে বললেন:

– আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটা সতর্কবার্তা পাঠালেন। সামনে আর ঘুষ নেয়া যাবে না। বলা তো যায় না, আজ হয়তো হাতের কনুইয়ের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেছে। পরের বার জানের ওপর দিয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়

(কর্মফলগুলো আমরা অবশ্যই পাই। কিন্তু সমস্যা হলো ওটাই যে কর্মফল সেটা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না)।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৭

আপনক্ষেত্রে বিচরণ

একদল সদ্য পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, তাদের গবেষণার সুবিধার্থে, দূরের এক দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়লো। দেশের সরকার থেকে তারা পুরো দ্বীপটা লীজ নিয়ে নিলো। সরকার শর্ত দিলো, দ্বীপের আদিবাসীদেরকে আপন আপন গৃহে থাকতে দিতে হবে। আর তাদেরকে নিজস্ব পেশায়, কৃষিকাজে বাধা দেয়া চলবে না।

ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষ থেকে বলা হলো:

– আমরা বাধা দেয়া তো দূরের কথা, তাদের কৃষিকাজ কিভাবে সহজ হয় সে চেষ্টাই বরং করবো। আমাদের গবেষণাটাও কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়েই।

ইঞ্জিনিয়াররা তাদের গবেষণাকর্ম শুরু করে দিলো। নিত্য নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে লাগলো, আর সেগুলোর কার্যকারিতা দ্বীপের আদিবাসী কৃষকদেকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে থাকলো। কোন যন্ত্রে সমস্যা দেখা দিলে সেটা দূর করার চেষ্টা করলো। কৃষকরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে লাগলো। তারা তাদের ফসল থেকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, একটা অংশ ইঞ্জিনিয়ারদেরকেও দিতে শুরু করলো। ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের খাওয়ার চিন্তা করতে হলো না। একমনে তারা গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলো।

শুধু তাই নয়, দ্বীপের নিরক্ষর মানুষদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করলো। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে দ্বীপের চাষাবাদে ব্যাপক উন্নতি দেখা দিলো। আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে, অনেক বেশি ফসল উৎপাদিত হতে লাগলো। দিনগুলি খুবই সুন্দর আর শৃঙ্খলার সাথেই কেটে যাচ্ছিলো।

একদিন দ্বীপে একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী এলো। ব্যবসায়ী তার মেধা, বুদ্ধি ও চতুরতা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেকের কাছেই একটি করে কম্পিউটার বিক্রি করলো। বেচা বিক্রির পর, ব্যবসায়ী আরো কিছুদিন দ্বীপে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বললো:

–আমার তো আরো কিছুদিন দ্বীপে থাকা দরকার। কারণ, কম্পিউটারগুলোতে সমস্যা দেখা দিলে, আপনারা তো সেটা সারাতে পারবেন

না। একজন মেকানিক প্রয়োজন হবে। অন্য মেকানিকের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমিই সে কাজ করে দেবো। বিনিময়ে যা হয় একটা কিছু আপনাদের বুঝ-বিবেচনা মতো দিবেন।

কিছুদিন যাওয়ার পর ব্যবসায়ীর মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এলো। সে কৃষকদের কাছে গিয়ে বললোঃ

-"আহা, তোমরা কত কষ্ট কর। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। অথচ ফসল বেচে আর ক'টা টাকাই বা পাও? ইঞ্জিনিয়ারদের অবস্থা দেখ। তারা সারাদিন আরামে চেয়ারে বসে থাকে আর কম্পিউটারে গেম খেলে। আসলে কি জানো? তারা চায়ঃ তোমরা খেত-খামারবন্দী হয়ে থাক। তোমাদেরকে এই বৈষম্য থেকে বের হয়ে আসতে হবে। একথা শুনে কৃষকরা ভাবলোঃ

-"ঠিকই তো। আমরা তো খেত-খামারবন্দী থাকতে পারি না।" আমরা কষ্ট করবো, আরেক দল পায়ের ওপর পা নাচিয়ে বসে বসে খাবে, তা হতে দেয়া যায় না।

এরপর ব্যবসায়ী কৃষকদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলো। ধীরে-ধীরে তাদের সবার কাছেও তার প্রতিষ্ঠানের তৈরী কম্পিউটার বিক্রি করলো। ব্যবসায়ী লোকটা কৃষকদেরকে কিছুটা ইঞ্জিনিয়ারিংও শিখিয়ে দিলো।

স্বভাবগতভাবে পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হওয়ার কারণে, কৃষকরা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে বেশ ভালোই করতে লাগলো। তারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারের মত না হলেও, দেখা গেল তাদের কেউ কেউ মধ্যম বা নিম্ন পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হলো।

এভাবে কৃষক ও ইঞ্জিনিয়ার, যারা এতদিন পরস্পরের সহযোগী ছিল, তারা হয়ে গেল পরস্পরের প্রতিযোগী। তারা একে অপরের রফীক না হয়ে ফরীক হয়ে গেলো।

এবার দেখা দিল নতুন সমস্যা। কৃষকরা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে উৎসাহিত হয়ে পড়লো। ফলে কৃষি কাজ করার কেউ রইল না। দেশে দেখা দিল খাবারের সংকট। অন্যদিকে কৃষিকাজ না থাকায় ইঞ্জিনিয়াররাও আর নতুন কিছু আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেলো না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিল হতাশা ও হীনমন্যতা। উপায় না দেখে তারা সেই ব্যবসায়ীর কাছে ছুটে গেল সমাধানের জন্য।

ব্যবসায়ীর তো তখন রমরমা ব্যবসা চলছে। আর কৃষক ও ইঞ্জিনিয়ারদের যার যার পেশায় ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে, তার নিজের ব্যবসা নষ্ট করার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

সে এক অভিনব সমাধান দিলো। সবাইকে বললো:

- তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাশাপাশি কৃষিকাজও করা উচিত। সুতরাং এখন ইঞ্জিনিয়ার এবং কৃষক উভয়ই তাদের দিনের কিছু অংশে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ করবে আর কিছু অংশে কৃষিকাজ করবে। সবাই ভাবলো:

- যাক, সমাজে বুঝি শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু না, দেখা দিল আরেক বিপত্তি।

মেধাবী ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা কৃষিকাজের জন্য তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারছে না। ফলে এখন আর আগের মত নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে না। আবার দক্ষ কৃষকরা তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের চাপে কৃষিকাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারছে না। তাই এখন আর মাঠভরা ফসল হচ্ছে না।

ফলে দুটি ক্ষেত্রের মাঝে শান্তি ও সমতা আনতে গিয়ে, তাদের উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৮

শয়তানের সাক্ষাৎকার

একজন নামাযি লোক ঘুমিয়ে আছে। ফযরের আযান হলো। লোকটা আড়মোড়া ভেঙে নামাজের জন্য ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মসজিদে যেতে হবে। শয়তান এটা দেখে দ্রুত চলে এলো। বললো:

– রাত এখনো অনেক বাকি আছে, আরামসে ঘুমাও।

নামাযি: ঘুমিয়ে পড়লে, আমার ফরয ছুটে যাওয়ার আশংকা আছে।

শয়তান: ফজরের ওয়াক্ত শেষ হতে এখনো অনেক সময় বাকি।

নামাযি: নাহ আর দেরি করলে, জামাত ছুটে যাবে।

শয়তান: আরে ভাই! ইবাদত করতে গিয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেলো না। মনের উপর বেশি চাপাচাপি করো না। বিগড়ে যাবে।

নামাযি ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো। সূর্য ওঠার পর ঘুম ভাংলো। শয়তান এসে কানে কানে বললো:

– আফসোস করো না। সামনে সারটা দিন পড়ে আছে। কাযা আদায় করে নিতে পারবে।

লোকটা যিকির করতে বসলো। শয়তান লোকটার মনের ভেতর নানা চিন্তার দরজা খুলে দিলো। লোকটা আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো:

– তুমি দেখি আমার যিকিরও নষ্ট করতে চাইছো।

শয়তান: আরে, সারা দিন পড়ে আছে। যত ইচ্ছা যিকির করতে পারবে। অত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছো কেন? এখন যিকির রাখো। বিকেলে করো।

লোকটা তাওবার করার প্রস্তুতি নিলো। শয়তান বললো:

-এখনো যৌবনের মৌবনে আছো। খানিকটা ভোগ-বিলাস করে নাও।

- আমি মৃত্যুকে ভয় করি।

শয়তান: জীবন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

লোকটা কুরআন তিলাওয়াত করতে গেলো। প্রতিদিনই কিছু না কিছু হিফয করে। শয়তান বললো:

- কুরআন পড়লে তেমন মজা পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং আসো, গান শোনা যাক।

- গান শোনা তো হারাম।

- কোন কোন উলামায়ে কেরামের মতে গান শোনা জায়েয।

নামাযি: কিন্তু গান শোনা যে হারাম, সে বিষয়ের হাদীসগুলো তো আমার নোটবইয়ে লেখা আছে।

শয়তান: ওই হাদীসের সবগুলোই যয়ীফ (দুর্বল)।

লোকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় সামনে এক সুন্দরী মেয়ে পড়লো। চোখ নামিয়ে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে যেতে উদ্যত হলো।

শয়তান: চোখ নামিয়ে নিলে যে?

নামাযি: বেগানা নারীর দিকে তাকানো বিপদজনক।

শয়তান: তুমি সৌন্দর্য পছন্দ করো না? তাদাব্বুর করো না? তাদাব্বুর তো হালাল।

নামাযি লোকটা ওমরায় যাওয়ার নিয়তে ঘর থেকে বের হলো। শয়তান এসে সামনে দাঁড়ালো।

- এত কষ্ট করে কোথায় যাচ্ছো?

- ওমরা করতে যাচ্ছি।

- এই সামান্য নফল ওমরার জন্য তো তুমি নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। যদি পূণ্যি কামাতে চাও, সেটার জন্য অনেক উপায় আছে। ওমরার চেয়েও বড় সওয়াবের কাজ তুমি ঘরে বসেও করতে পারো।

নামাযি: নিজের অবস্থার তো পরিবর্তন দরকার। সংশোধন দরকার। সেজন্যই বেশি বেশি নেক আমল করা দরকার।

শয়তান: নেক আমল দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

নামাযি লোকটা ওয়ায শুনতে যাচ্ছিলো। পথে শয়তান পথরোধ করে দাঁড়ালো।

– তুমি কেন নিজেকে অপমানের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছো। ওয়াযে গেলে, হুযুর অনেক কথা বলবেন। তোমার অনেক পাপের কথা জনসম্মুখে ফাঁস করে দিবেন।

নামাযি লোকটা এবার নিজেই বক্তা হয়ে, এক জায়গায় ওয়ায করতে চললো। শয়তান এসে বললো:

– কোথায় চললে?

– এই একটু ওয়ায করতে যাচ্ছি।

শয়তান: আমি আশংকা করি, অন্যদেরকে ওয়ায করতে গেলে তোমাকে খ্যাতির মোহে পেয়ে বসবে। আর এই মোহটাই হলো সমস্ত পাপের মূল।

নামাযি: কিন্তু ওয়ায তো বান্দার জন্য খুবই উপকারী। আত্মশুদ্ধির জন্য ওয়ায শোনাটা প্রয়োজন।

এবার নামাযি লোকটা শয়তানকে বললো:

- আমি কয়েকজন মানুষ সম্পর্কে জানতে তোমার মতামত জানতে চাই।

- তারা কারা? একজন একজন করে বলো।

- ইমাম আযম?

- সাহাবায়ে কেরামের পর, তিনিই তো উম্মাতে মুসলিমাকে সব চেয়ে বেশি হিদায়াতের পথে এনেছেন। তার ফিকহি প্রজ্ঞার কারণেই ইসলামের

বিধি-বিধান আজ এতটা সুন্দরভাবে গ্রন্থিত আছে। না হলে, আমি আরো অনেক আগেই, অনেক সহজেই মুসলমানদেরকে মুক্ত চিন্তার দিকে আহবান করতে পারতাম।

- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?

শয়তানঃ আহ, ইনি তো আমার চরম শত্রু। তার একটা কথা আমার বুকে শেলের মতো বিঁধে। তিনি খালকে কুরআনের ফিতনার সময় বলেছিলেন, তোমার আল্লাহর কালাম ও রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। তার কথা শুনে আব্বাসী যুগের মানুষেরা দ্বীনের পথে ফিরে এসেছিলো।

- আর ফিরাউন?

- আহ্ সে তো আমার পরম বন্ধু। সে আমাকে সার্বিক ভাবে সাহায্য করে গিয়েছিলো, যতদিন যে বেঁচে ছিলো।

নামাযিঃ হিত্তীনের বীর মুজাহিদ সালাহুদ্দীন (রহ.) সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

শয়তানঃ তার কথা চিন্তা হলেও আমার গা শিউরে ওঠে।

নামাযিঃ দ্বীনের দাঈদের সম্পর্কে তোমার ভাবনা কী?

শয়তানঃ ওরে বাবা! অমি তো সারাক্ষণ তাদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছি। তারা আমাকে অনবরত দৌড়ের উপর রাখছে। আমার নির্মিত সমস্ত প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। অমি কিছু করতে গেলেই তারা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষকে পাপে লিপ্ত করতে গেলেই তারা ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

নামাযিঃ আবু জাহল আর আবু লাহাব?

শয়তানঃ তারা দুজন তো আমার আপন ভাইয়ের মতো।

নামাযিঃ স্ট্যালিন?

শয়তানঃ তাকে তো জাহান্নামের তলদেশে লেনিনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে।

নামাযিঃ খোলামেলা পত্রিকাগুলো সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

শয়তানঃ এই ধরনের বই-পত্রিকাগুলো আমার সংবিধানের মতো।

নামাযিঃ ডিশ বা স্যাটেলাইট সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

শয়তানঃ এগুলো মানুষকে পশুতে পরিণত করে। আমার কাজের অনেক সুবিধা করে দেয়।

নামাযি: নাইট ক্লাবগুলো?

শয়তান: সেগুলো তো আমার মসজিদ। ইবাদতগাহ।

নামাযি: তোমাদের যিকির কী?

শয়তান: গানবাদ্য।

নামাযি: তোমাদের আমল কী?

শয়তান: অলীক আশা-আকাঙ্খা।

নামাযি: মার্কেট-শপিং মলগুলো নিয়ে তোমাদের কর্মকাণ্ড কী?

শয়তান: মার্কেট-শপিং মলগুলো হচ্ছে আমাদের সম্মেলন কেন্দ্র। কমিউনিটি সেন্টার।

নামাযি: কমিউনিস্ট ও বাম ঘরানার দলগুলো নিয়ে তুমি কী করো?

শয়তান: তাদেরকে আমার সহায়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছি। আমার বিভিন্ন পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছি। কিভাবে আমার পূজা করতে হবে তাও তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি। তারা সে অনুযায়ী চলছে।

নামাযি: তুমি কিভাবে মানুষকে গোমরাহ করো?

শয়তান: প্রবৃত্তির চাহিদা ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে। খেলাধূলা-গানবাদ্য-অন্তহীন লোভ-লালসার মাধ্যমে। অবৈধ প্রেমের মাধ্যমে।

নামাযি: তুমি নারীদেরকে কিভাবে গোমরাহ করো?

শয়তান: ঘর থেকে বোরকাহীন বের করে আনার মাধ্যমে। নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের মাধ্যমে। ইদানিং মোবাইল-ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

নামাযি: তুমি ওলামায়ে কেরামকে কিভাবে গোমরাহ করো?

শয়তান: আত্মপ্রকাশ, আত্মমুগ্ধতা, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, দুনিয়ার প্রতি লোভ, পদলিপ্সার মাধ্যমে।

নামাযি: সাধারণ মানুষকে কিভাবে গোমরাহ করো?

শয়তান: গীবত, চোগলখোরি, টিভি-স্যাটেলাইটের মাধ্যমে।

নামাযি: ব্যবসায়ীদেরকে কিভাবে গোমরাহ করো?

শয়তান: সুদী লেনদেনের মাধ্যমে। যাকাত-সাদকা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে। ব্যায়ের ক্ষেত্রে অপচয়ের মাধ্যমে।

নামাযি: যুবকদেকে কিভাবে গোমরাহ করো?

শয়তান: গান, অন্ধপ্রেম, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে। হারাম কাজে লিপ্ত করার মাধ্যমে।

নামাযি: ইহুদি রাষ্ট ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার অবস্থান কী?

শয়তান: গীবত করা মহাপাপ। ইসরাঈল একটা সুন্দর দেশ। বন্ধুদেশ। প্রিয় দেশ।

নামাযি: ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিষয়টাকে তুমি কিভাবে দেখো?

শয়তান: আরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো আমার ঈমান। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা হলো বিশ্বে আমার ধর্মের প্রবক্তা। যার তাদের অনুসরণ করলো, তারা প্রকারান্তরে আমাকেই অনুসরণ করলো।

নামাযি: ওয়াশিংটন জায়গাটাতে তোমার কিছু হয়?

শয়তান: হয় মানে? সেখানেই তো আমার মুখপাত্ররা থাকে। ওটাই তো আমার অফিস। আমার সেনাবাহিনীও সেখানেই অবস্থান করে। মোটকথা ওয়াশিংটন আমার বাসভূমি।

নামাযি: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়ে তোমার পরিকল্পনা কী?

শয়তান: এগুলোই হলো আমার ভরসার কেন্দ্র। পত্র-পত্রিকা দ্বারা সবার সময়কে নষ্ট করতে পারি। অহেতুক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রাখতে পারি।

নামাযি: বিবিসি সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

শয়তান: আর কী বলবো। বিবিসির মাধ্যমে আমি সারা বিশ্বে বিষ প্রবাহিত করি। মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে রাখি।

নামাযি: তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

শয়তান: গায়ক-গায়িকা। নায়ক-নায়িকা। ধর্মহীন লেখকগোষ্ঠী।

নামাযি: তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু কে?

শয়তান: যারা নিয়মিত মসজিদে যায়। যারা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিতে বের হয়। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

নামাযি: তোমাকে আটকানোর উপায় কী?

শয়তান: আয়াতুল কুরসি। এটা শুনলেই আমার অন্তরটা সংকুচিত হয়ে আসে। নিজেকে বন্দী বন্দী লাগে।

জীবন জাগার গল্প : ২৬৯

মোসোইদের টেঁআগুন দী যান

নামায পড়ে ছাদ থেকে নেমে আসছি। সিঁড়ির মুখেই মসজিদের একজন খাদিম দাঁড়িয়ে আছেন।

হাতে কালো থলে।

এক নাগাড়ে, বিরতিহীনভাবে, একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছেন:

-মোসোইদের টেঁআগুন দী যান (মসজিদের টাকাগুলো দিয়ে যান)।

বাক্যটা শুনতে কেমন যেন লাগছিলো। বাক্যটার সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়: আপনার কাছে মসজিদের টাকা আছে, সেগুলো দিয়ে যান (নইলে..)।

এমন হুমকির সুরে টাকা চাইলে বিনয়ীতম ব্যক্তিও টাকা দেয়ার কথা ভাববে না।

আমি লোকটাকে পার হয়ে সামনে এগুলাম। এমন সময় একজন মানুষ ধরে বসলেন:

-ও মিয়াঁ! আপনি যেভাবে টাকা চাচ্ছেন, কেউ তো টাকা দিতে চাইবে না।

বলুন, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু সাহায্য করুন। বা দয়া করে মসজিদের জন্য কিছু দিয়ে যান।

জীবন জাগার গল্প : ২৭০

মায়ের দু'আ

রিহলা মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে। বাবা দাহরানে এক তেল কোম্পানিতে চাকরি করে। প্রতিদিন ড্রাইভার তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে। সাথে গাড়িতে আম্মুও স্কুল পর্যন্ত যান। আসার সময় আম্মু নানুর বাসায় নেমে পড়েন। গাড়ি চলে যায় আব্বুর অফিসে।

ড্রাইভারের মনে অনেক দিন থেকে একটা দুরভিসন্ধি ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু সুযোগ মিলছিলো না। গত মাসে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, আগামী মাস থেকে সে আর এখানে চাকরি করছে না।

ড্রাইভার অনেক চেষ্টা-তদবির করে, বাড়ির পরিচারিকার সাথে হাত করলো। তাকে অনেক টাকা দিয়ে রাজি করালো।

ঘটনার দিন পরিচারিকা ইচ্ছা করেই রিহলার স্কুল ড্রেসটা পানিতে ভিজিয়ে রাখলো। স্কুলে যাওয়ার সময় হলে সে বললো:

–গতরাতে ভিজিয়ে রেখেছিলো। ধুতে ভুলে গেছে। তাড়াতাড়ি ধুয়ে দিচ্ছি বলে সে কাপড় কাঁচতে বসলো।

আম্মু সব দেখে বললেন:

–থাক, হয়েছে আজকে আর স্কুলে যেতে হবে না। ঘরে বসে পেছনের পড়া তৈরি করো। তুমি দরজা বন্ধ করে রাখো। আমি তোমার নানুর বাসায় যাচ্ছি।

প্রতিদিন স্কুলে রেখে আসার সময় আম্মু রিহলার হাত ধরে দু'আ করেন:

–আসতাওদিউকিল্লাহাল্লাযী লা ইউদিউ ওয়াদাইআহু। (আমি তোমাকে আমানত হিসেবে রাখছি আল্লাহর কাছে। যিনি তার আমানতসমূহকে নষ্ট হতে দেন না)।

আজও আম্মু নানুর বাসায় যাওয়ার আগে এই দু'আ করে যেতে ভুললেন না। রিহলা অবাক হয়ে জানতে চাইলো:

- আম্মু আজ কেন দু'আ করছো? আজ তো আমাকে স্কুলে রেখে যাচ্ছো না।

- স্কুলে রেখেই কি শুধু দু'আ পড়তে হয়? তুমি আমার চোখের আড়াল হলেই আমি এই দু'আ পড়ি। তুমি খেয়াল করো নি বলে জানতে পারো নি।

মা চলে গেলেন। ড্রাইভার মাকে নামিয়ে দিয়ে, অফিসে না গিয়ে সোজা বাসায় চলে এলো। পরিচারিকার সাথে শলা-পরামর্শ করে রিহলার কামরার দিকে গেলো।

জোরে জোরে বন্ধ দরজায় আওয়াজ দিলো। রিহলা দরজা খুলে দিলো। ড্রাইভার এগিয়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই তার হাত-পা অবশ হয়ে গেলো। পুরো শরীরটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলো।

এরই মধ্যে আম্মুও চলে এলেন। তিনি এসে ড্রাইভারের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন:

-আল্লাহ তা'আলা তার দু'আকে বৃথা ফেরত দেন নি।

(প্রতিটি মা-বাবারই উচিত সব সময় সন্তানের জন্য দু'আ করা। বিশেষ করে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রত্যেক বাবা-মারই উচিত সন্তানের জন্য উপরোক্ত দু'আটা পড়া)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ২৭১

আতরের ফাঁদ

খলীফা মানসুর খাস কামরায় বসে আছেন। জবরদস্ত আব্বাসী খলীফা। গা-টা এলিয়ে দিয়ে কবি আবু নাওয়াসের একটা দিওয়ান পড়ছিলেন গুনগুন করে। চোখ পড়লো জানলা দিয়ে বাইরে। একটা লোক উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিশেহারা ভাব চোখেমুখে। লোকটাকে ডেকে পাঠালেন।

এমন বেকারার হয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছো কেন?

-আমি একজন মসলা ব্যবসায়ী। এবারের চালানে আমার অনেক টাকা লাভ হয়েছিলো। সব টাকা এনে স্ত্রীর কাছে জমা রেখেছিলাম। কয়দিন পর স্ত্রী জানালো, আমার সব পুঁজি চুরি হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে ব্যবসা করার মতো কোনও দীনার-দিরহাম নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেছে আমীরুল মুমিনীন!। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, ঘরে চোর ঢোকার কোনও আলমতই খুঁজে পাইনি।

-তুমি বিয়ে করেছ কয়দিন হয়েছে?

-এই বছর খানেক!

-কুমারী বিয়ে করেছিলে নাকি বিধবা?

-বিধবা।

-তোমার স্ত্রীর আগের ঘরের কোনও সন্তান আছে?

-জ্বি না।

-তোমরা স্ত্রী কি যুবতী না বয়স্ক?

-যুবতী।

খলীফা একটা আতরের শিশি আনালেন। বললেন:

-এই আতরের শিশিটা রাখ। এই আতর শুধু আমার জন্যই বানানো হয়। আর কোথাও পাবে না। এটা একটা বিরল আতর। আতরটা গায়ে মাখলে তোমার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে।

লোকটা প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার পর, খলীফা চারজন বিশ্বস্ত খোঁজা প্রহরীকে ডেকে বললেন:

-তোমরা বাগদাদ থেকে বের হওয়ার চারটা ফটকে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো। শহর ছেড়ে বের হওয়া প্রতিটি মানুষের গা শুঁকে দেখবে, যার গায়েই আমার আতরের ঘ্রাণ পাবে, গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে।

ব্যবসায়ী বাড়িতে গিয়ে আতরটা স্ত্রীর কাছে রাখতে দিলো।

-এটা অত্যন্ত দামী আতর। একমাত্র খলীফার কাছেই এ আতর আছে। যত্ন করে তুলে রাখো। চাইলে তুমি মাখতে পারো।

স্বামী ঘরে থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর, স্ত্রী আতরের কিছুটা আরেক শিশিতে নিয়ে, ঘর থেকে বের হলো। পাশের বাড়িতে গিয়ে 'একজন'কে আতরটা দিয়ে এলো।

পরদিন সকালের দিকে একজন প্রহরী দেখলো, একজন লোকের গা থেকে খলীফার আতরের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করলো।

-তুমি এই আতর কোথায় পেয়েছো?

-আতরটা আমি কিনেছি।

-কোত্থেকে কিনেছো?

-লোকটা এবার উত্তর দিতে আমতা আমতা করতে শুরু করলো।

খলীফা পুলিশ ডেকে লোকটাকে গ্রেফতার করতে বললেন। বলে দিলেন:

-এই লোক যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ দীনার আদায় করে তাহলে একে ছেড়ে দিবে।

লোকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দীনার আদায় করতে সম্মত হলো। এবার খলীফা ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন।

-আমি যদি তোমার চুরি হওয়া দীনার ফিরিয়ে দেই, তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিবে?

-অবশ্যই আমীরুল মুমিনীন।

-এই নাও তোমার চুরি যাওয়া দীনার। আর আমি তোমার স্ত্রীকে তোমার পক্ষ থেকে তালাক দিলাম। এমন স্ত্রী তোমার ঘরে থাকা তোমার জন্য নিরাপদ নয়। একজন ব্যবসায়ীর ঘরে প্রয়োজন বিশ্বস্ত আর আমানতদার পুণ্যবতী স্ত্রী।

জীবন জাগার গল্প : ২৭২

একতাই বল

এক শ্বাপদসংকুল গভীর বনে, চারটা গরু বাস করতো, এক সাথে। দলবদ্ধ হয়ে। সংঘবদ্ধ হয়ে। তিনটা গরু ছিলো মিশমিশে কালো আর একটা ছিলো ধবধবে শাদা।

গরুগুলোর চারপাশে নেকড়ে গিজগিজ করতো। সারাক্ষণ ওঁত পেতে থাকতো কখন গরুগুলোকে কখন খাওয়া যায় এই আশায়। কিন্তু কোনও সুযোগই পাচ্ছিলো না।

গরুগুলো যেদিকেই যেতো, একসাথে যেতো। রাতে ঘুমুনোর সময়ও একসাথে ঘুমুতো। চারটা গরু চারদিকে মুখ করে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতো। চারদিকে সজাগ সৃষ্টি রাখতো। কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারতো না। গরুদের এই দুর্লঙ্ঘ একতা দেখে, নেকড়েগুলো একটা ফন্দি আঁটলো। গরুগুলোর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে হবে। এই কৌশল সফল হলেই কেল্লাফতে। নেকড়েদের বৈঠক বসলো। ঠিক হলো তারা শাদা গরুটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। বাকি তিন গরুকে আকারে-ইঙ্গিতে এটা বুঝ দেয়ার চেষ্টা করা হবে যে:

-তোমাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শাদা গরুটাই আমাদের সমস্ত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

কয়েকদিনের একটানা চেষ্টার পর, তিন কালো গরুর মাঝে ভাবান্তর দেখা দিলো। দেখা গেলো তারা মাঝেমধ্যে আলাদা হয়ে কী সব বলাবলি করছে। নেকড়েদের জিবে জল এসে গেলো। তারা ধরেই নিলো তাদের টোপ গিলতে গরুদের আর দেরি নেই। হলোও তাই। পরদিন তিন কালো গরু ঘোষণা দিলো:

-আমাদের সাথে কোনও শাদা গরু থাকতে পারবে না। শাদা রঙের কারণে, শত্রুরা আমাদের অবস্থান সহজেই শনাক্ত করে ফেলে। কোথাও নিরাপদে লুকিয়ে থাকা যায় না। এখন থেকে আমরা তিন কালো একসাথে থাকবো। শাদা রঙ আমাদের সাথে থাকতে পারবে না।

নেকড়ের দল সুযোগ বুঝে শাদা গরুটার ওপর হামলে পড়লো। তিন কালো অদূরে দাঁড়িয়ে দেখলো:

-নেকড়ের দল খুবলে খুবলে শাদা গরুটার গোশত খাচ্ছে। কেউ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো না।

একটা গরু কমে যাওয়াতে, গরুদের পাহারা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লো। একটা দিক অরক্ষিত হয়ে গেলো। সেই রাতেই নেকড়ের পাল হামলা করে একটা গরু নিয়ে গেলো। পরে রাতে আরেকটা। বাকি ইলো একটা গরু। গরুটা প্রাণভয়ে সারাদিন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ালো। নেকড়ের দল অলসভঙ্গিতে বসে থেকে গরুটার অর্থহীন দৌড়াদৌড়ি দেখলো। গরুটা ক্লান্ত হয়ে এলেই হামলা করবে।

এক সময় গরুটা শক্তি হারিয়ে নেতিয়ে পড়লো। নেকড়ের পাল ধীরে সুস্থে গরুটার ঘাড় মটকালো। গরুটা আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে আক্ষেপ করে বললো:

-আমি তো সেদিনই আমার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছি, যেদিন শাদা গরুটাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি।

জীবন জাগার গল্প : ২৭৩

নির্মম সত্য

এক লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছে। নিজস্ব গাড়িতে করে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা হাত তুললো।

-কী ভাই! কেন হাত তুলেছো?

-ভাই আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। আমাকে কি একটু গাড়িতে তোলা যাবে?

-না ভাই, দুঃখিত। আমি আর আমার স্ত্রী অনেকদিন পর একসাথে বেড়াতে বের হয়েছি। তোমাকে নেয়া যাবে না।

- আমি কে জানো? আমি হচ্ছি 'ইউ এস ডলার'।

গাড়ির চালক ভাবলো, সহধর্মিনী তো সবসময়ই আছে। তারা পরে অন্য এক সময় ঘুরতে বের হতে পারবে। কিন্তু ডলার তো সব সময় পাওয়া যাবে না। স্ত্রীকে পেছনে বসিয়ে মি. ডলারকে সামনে বসতে দিলো।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার আরেক ব্যক্তি হাত তুলে লিফট চাইলো।

-দু:খিত, আমি আমার পরিবার নিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে নেয়া যাবে না।

-জানো আমি কে? আমি হলাম পাউন্ড। ডলারের প্রায় দ্বিগুণ মূল্যমানের অধিকারী আমি।

-আচ্ছা, ঠিক আছে, গাড়িতে উঠে এসো।

লোকটা স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ির পেছনের বুটে বসালো। পাউন্ডকে পেছনের আসনে বসাল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেক ব্যক্তি হাত তুললো। গাড়ি থামিয়ে লোকটা বললো:

-ভাই গাড়িতে আর জায়গা নেই। ইচ্ছা থাকা সত্তেও সম্ভব নয় আর কাউকে গাড়িতে তোলা।

-তুমি আমাকে চেনো, আমি কে?

-না ভাই, চিনি না।

-আমি হচ্ছি ইসলাম। আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলে তোমার ভবিষ্যত সুন্দর হবে। আখিরাত নিরাপদ হবে। কবরের জীবন আরামের হবে। কিয়ামতের মাঠে ছায়ায় স্থান পাবে। এছাড়া আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে।

-না ভাই, তোমাকে নেয়া সম্ভবই নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। খুবই পছন্দ করি। কিন্তু সাথে যারা আছে তাদেরকে নামিয়ে দিয়ে তো আর তোমাকে তুলতে পারি না। তুমি এক কাজ করো, আরেকটু সামনে গেলেই একটা মসজিদ পাবে, ওখানে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমি জুমাবারে তোমার সাথে দেখা করবো। আচ্ছা, চলি।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেক পথিক হাত উঠাল। গাড়ি থামলো।

-আপনি কে? আমার গাড়ি একদম ভর্তি। আপনাকে নিতে পারবো না।

-আমাকে নিতে হবে না। আমিই আল্লাহর হুকুমে তোমাকে নিতে এসেছি। আমি মালাকুল মাওত।

-ভাই আমাকে একটু সময় দেয়া যাবে? আমি পেছনে গিয়ে গাড়ির যাত্রীদেরকে নামিয়ে দিয়ে, রেখে আসা এক যাত্রীকে নিয়ে আসতাম?

-নাহ, তোমার সময় পার হয়ে গেছে। তোমাকে অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। তুমি কাজে লাগাতে পারো নি।

জীবন জাগার গল্প : ২৭৪

লবণওয়ালা

তখন পটিয়াতে পড়ি। একটা বছর বাইরে মেসে থাকতে হয়েছে। পটিয়া কলেজের পশ্চিম পাশের এক তিনতলা বিল্ডিংয়ে। আমার লজিং বাড়ির অদূরেই।

বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তায় লোক চলাচল থেকে শুরু করে সব দেখা যেতো। বারান্দাটা ছিলো দক্ষিণমুখী।

বাতাসের অভাব ছিলো না। সুন্দর দৃশ্যের কমতি ছিলো না।

প্রতিদিন সকালে একটা দৃশ্য দেখে মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে যেতো।

প্রতিদিন বিকেলে একটা দৃশ্য দেখে মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে যেতো।

একজন বৃদ্ধলোক। শরীরটা অত্যন্ত শীর্ণ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। গালদুটি তোবড়ানো। মুখের চামড়ায় বলিরেখা কুঁচকে কুঁচকে আছে। পলিতকেশ। লোলচর্ম।

এত বয়েসেও মানুষটা প্রতিদিন, একটা বাঁশের দু'মাথায় দুটো কোরা (বাঁশের ঝাঁকা) বেঁধে, কাঁধে নিয়ে বের হতো। লবণভর্তি কোরা। বিক্রির জন্য। জীবিকার জন্য।

দেখতাম মানুষটা হাঁটতে পারছে না। পা চলছে না। দুই কোরায় কমপক্ষে দশ দশ করে বিশ কেজি লবণ তো হবেই। এই রোদ না ওঠা সকালেও মানুষটাকে দরদর ঘামতে দেখতাম। অসম্ভব খারাপ হওয়া মন নিয়ে মাদরাসায় যেতাম।

বিকেলে আসার সময়ও সেই একই অবস্থা। বলা ভালো আরও খারাপ। একটু পর পরই দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছেন। আবার হাঁটছেন। দুই ঝাঁকায় লবণের পরিমাণ সকালের তুলনায় কম।

দেখতাম বিক্রি না হওয়া লবণের পাশে ছোট একটা পলিথিনের ব্যাগে আধা কেজি পরিমাণ চাউল।

মাঝেমধ্যে বিকেলে দেখতাম ঝাঁকার লবণ সকালে যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেছে। চাউলের পলিথিনও নেই।

বিক্রি হয় নি, চাউল কেনার টাকার বন্দোবস্ত হয় নি।

রাতে গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইতো না।

একজন মানুষকে এই শেষ বয়েসেও কেন জীবিকার জন্য এই অমানুষিক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করতে হবে?

এত কষ্ট লাগতো! এতো কষ্ট লাগতো!

জীবন জাগার গল্প : ২৭৫

আম্মুর সাত মিথ্যা

জোয়ার্দার সাহেব একজন সফল ব্যক্তি। জীবনে অনেক সংগ্রাম করে, আজ তিনি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক। নিউইয়র্কের মতো শহরে তার বিশাল নিজস্ব বাড়ি। ঢাকাতে কয়েকটা বাড়িসহ আরো অনেক ব্যবসার মালিক তিনি। এত কিছুর পরও তিনি তার সাফল্যের নেপথ্য অনুপ্রেরণা তার মাকেই মানেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো:

-আপনার এই বর্তমান সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় উঠে আসার মূল রহস্যটা কী?

-মিথ্যা কথা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অবাক। একটু খুলে বলবেন, স্যার?

-তাহলে শোন:

১. আমার জন্ম গরীব ঘরে। জন্মের পরই আব্বু মারা যান। ঘরে খাবার নেই। উপায়-উপার্জন নেই। আম্মু মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করতেন। আসার সময় সামান্য খাবার নিয়ে ফিরতেন। সবটা খাবারই আমাকে দিয়ে বলতেন:

-বাবা, খাবারটুকু খেয়ে নে। আমার ক্ষুধা নেই।

অথচ আমি জানতাম আম্মু না খেয়ে আছেন।

২. আরেকটু বড় হলাম। আমি মাছ খেতে খুবই পছন্দ করতাম। অন্যের বাড়িতে কাজে বের হওয়ার আগে, আম্মু প্রতিদিন খুবই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যেতেন। মাঘ মাসের শীতের রাতে, তিনি পুকুরে নামতেন, আমার জন্য

হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরতেন। খেতে বসলে মাছ আমার পাতে তুলে দিতেন। আমি আপত্তি করলে বলতেন:

-বোকা ছেলে! আমি মাছ খাই না যে তুই বুঝি জানিস না? মাছের আঁশটে গন্ধ আমার সহ্য হয় না। বমি আসে।

আমি বুঝতে পারতাম, যে মানুষ কাঁচা মাছ ধরতে পারে, সে মানুষ রান্না মাছও খেতে পারে।

৩. আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। আমার একটাই জামা ছিলো। স্কুলে আর ঘরে সেই একটা জামা পরেই থাকতে হতো। বর্ষাকালে, একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময়, আছাড় খেয়ে পড়ে জামাটা ময়লা হয়ে গিয়েছিলো।

আম্মু যে বাড়িতে কাজ করতেন, সে বাড়িতে বিয়ে থাকায়, সেদিন তাঁর ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাংলে দেখি, আম্মু আমার ময়লা জামাটা ধুচ্ছেন।

-আম্মু, এত রাতে কী করছো?

-ঘুম আসছে না রে, তাই ভাবলাম জামাটা ধুয়ে রাখি।

অথচ আমি দেখলাম জামাটা ধুতে ধুতে আম্মু ঝিমুতে ঝিমুতে পড়ে যাচ্ছেন।

৪. স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষার দিন হল থেকে বের হয়ে এলাম। ভীষণ পিপাসা পেয়েছিলো। স্কুল গেইটে একটা আইসক্রিমওয়ালা বসে ছিলো। আমাকে সেদিকে তাকাতে দেখে আম্মু আমাকে একটা আইসক্রিম কিনে দিলেন।

আম্মু এতক্ষণ রোদের মধ্যে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘামে গোসল হয়ে গিয়েছিলেন।

-আম্মু তুমিও একটু খাও না।

-না-রে খোকা! আমার গলা ব্যথা। ঠাণ্ডা সহ্য হবে না।

আমি জানতাম আম্মুর গলায় কোনও ব্যথা ছিলো না।

৫. দেশে লেখাপড়া শেষ করার পর, আমেরিকার একটা কলেজে স্কলারশীপ পেয়ে গেলাম। আম্মুকে বললাম:

-তোমাকে একা রেখে আমি কোথাও যাবো না।

-না বাবা, তুই যা। আমার একা থাকতে একটুও কষ্ট হবে না।

অথচ আমি জানতাম, আম্মু বাতের ব্যথায় সারাক্ষণ কাতারাচ্ছেন। আমাকে দেখলেই চুপ হয়ে যেতেন। ভান করতেন তার শরীরে কোনও রোগ নেই।

৬. কয়েক বছর পর, আম্মুকে আমেরিকা নিয়ে আসতে চাইলাম। তিনি বললেন:

-না রে বাবা! শেষ কটা দিন তোর বাপের ভিটাতেই কাটাতে চাই।

অথচ আমি নিশ্চিত জানতাম, এদেশে আসলে তার ভালো লাগবে। কিন্তু আম্মু আমাকে বিরক্ত করতে চান নি।

৭. এক রাতে টেলিফোন এলো, আম্মু হাসপাতালে। সাথে সাথে দেশে ফিরে এলাম। তাঁর শীর্ণ-কঙ্কালসার অবস্থা দেখে, আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

-কাঁদিস না খোকা, আমি সুস্থ আছি।

অথচ রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়াতে, সেই রাতেই তিনি আমাকে এতিম করে, না ফেরার দেশে চলে যান।

জীবন জাগার গল্প : ২৭৬

জান্নাতের পথে

জালওয়ান। গাযার সাগরতীরের একটা ছোট্ট গ্রাম। এই সাগর তীরের একটি খাঁড়িতেই আছে অত্যন্ত গোপন একটা ট্রেনিং সেন্টার। অত্যন্ত যত্ন করে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছে এই সঙ্গোপন স্থান। আজই প্রথম শহীদী কাফেলা রওয়ানা হবে। জান্নাতুর রাইয়ানের দিকে।

হিশাম হামাদি এবং আরও চার অকুতোভয়। বিকেলে ইফতার সেরে, মাগরিবের নামায আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ট্রেইনার রামাদি ইউসুফ বলেছিলেন, ঘুম থেকে উঠেই ইশা আর তারাবীহ পড়া হবে।

ঘুম থেকে উঠেই নামায সেরে নিয়েছে। শেষ মুহূর্তের ব্রিফিং শুরু হয়েছে। পাড়ি দিতে হবে প্রায় দশ কিলোমিটার। গন্তব্য যিকিম নেভাল বেস। এখান থেকে ইসরাঈল অনেক অপকর্ম ঘটায়। গাযামুখী সকল জাহাজকে ঠেকিয়ে রাখে।

অত্যন্ত সুরক্ষিত নৌঘাঁটি।

ফিলিস্তীনের ইতিহাসে এই প্রথম জলকমান্ডো হামলা হতে যাচ্ছে। ইহুদি ব্যাটারা ঘুর্ণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারবে না তাদের এই এয়ারটাইট ঘাঁটিতে পিঁপড়ে গলতে পারে। সে জন্য তারা ঠেসে ঘুম দিচ্ছে।

সবাই সেহরি খেয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকের চোখে ধিকি ধিকি জ্বলছে শাহাদাতের অমিয় তামান্না। কমান্ডার রিহাম খালিদ বলেছেন, সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে, ইনশাআল্লাহ আমরা ইফতার সারবো জান্নাতে।

পুরো ফিলিস্তীন আজ বিশ্বের বৃহত্তর কারাগার। গত কয়েকদিনে শতাধিক মযলুম শহীদ হয়েছেন। এটা আর চলতে দেয়া যায় না।

সবাই তাহাজ্জুদ পড়ে সৈকতে দাঁড়ালো। বেদি স্যুট পড়া। সুইম কস্টিউম আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে তৈরি। একে-৪৭, কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড আর কয়েক ম্যাগাজিন হেভি ক্যালিভার বুলেট।

আল্লাহু আকবার ! !

পাঁচজন বদরের যাত্রী ঝাঁপ দিলেন।

সৈকত ঘেঁষেই চলতে শুরু করলো পাঁচজন। বারবার বালুর সাথে ঘষা খাচ্ছে। গতি উঠছে না। পরামর্শ করে একটু গভীর পানির দিকে চলে গেলো। কাছাকাছি গেলে বাঁক নিয়ে আসা যাবে।

এর আগে তো মহড়ার সময়ও এমনটা কয়েক বার করেছে। গত সপ্তাহে রেকি করতে এসেও দেখে গিয়েছে। মাছ ধরার ছলে এসেও বেসটা ভালোভাবে মেপে গেছে। পরিকল্পনায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু কামিয়াবির মালিক আল্লাহ।

স্রোত ঠেলে এগুতে বেগ পেতে হচ্ছে। কস্টিউমের ভেতরে শরীর ঘেমে উঠেছে। যেভাবেই হোক ভোরের আগেই পৌছতে হবে। হামলাটা করতে হবে অতর্কিতে।

পরিকল্পনা অনুসারে হিশাম হামাদি সামান্য মুখ তুলে দেখলো কতদূর এসেছে। ঘড়ির হিসাব বলছে আরা মাত্র এক কিলোমিটার আছে। দূরে একটা

বাতি দেখা গেলো। কোনও জাহাজ হবে হয়তো। ভুশ করে নাকটা বের করেই আবার তলিয়ে গেলো হিশাম। যা দেখার দরকার ছিলো দেখা হয়ে গেছে।

মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেলো। বোধ হয় প্রাণপ্রিয় গাযার কোথাও রক্ত চুষতে যাচ্ছে।

বিরামহীন সাঁতার চললো। নৌঘাঁটিটা একদম সৈকত ঘেঁষেই। এখনো আলো-আঁধারি। পাঁচজনেই একে একে মাথা তুললো। চোখের গগলস খুলে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো।

একটা চৌকি দেখা যাচ্ছে। ঘাঁটির মূল ভবনটা ভেতর দিকে। সামনের দিকটাতে ওয়াচ টাওয়ার। একটা ফ্লাড লাইট চক্রাকারে ঘুরছে।

ওটার সাথে তাল মিলিয়েই দৌড়ে একটা আড়ালে যেতে সক্ষম হলো। আর বেশিদূর যাওয়া যাবে না। তারা এখনো খোলা জায়গায়। সামনে ব্যারাক পড়লো। আর দেরি না করে একটা গ্রেনেড চার্জ করলো। গগণবিদারী আওয়াজ করে ওটা ফাটলো। সাথে সাথে আরো কয়েকটা গ্রেনেড ছুঁড়লো।

ইহুদিগুলো নেংটো, আধনেংটো হয়ে ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিলো।

দলনেতা রিহাম খালিদ পুরো দলটাকে এবার তিনভাবে বিভক্ত করে দিলেন। নিজে একা গেলেন বিমান ঘাঁটির দিকে।

বেশিদূর যেতে পারলেন না, ওদিক থেকে একরাশ মেশিনগানের বুলেট ছুটে এলো। সাথে সাথে আত্মরক্ষার্থে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গন্তব্যে তাঁকে পৌছতেই হবে। আজকের এই আক্রমণের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে, ভবিষ্যতের আরো অনেক জলকমান্ডো হামলার পরিকল্পনা।

মাটি কামড়ে ক্রল করে আরো সামনে এগুলেন। আর অল্প। ওই তো দেখা যাচ্ছে। একটা গ্রেনেড হাতে নিলেন। পিন খুলেই থ্রো করলেন। তিনি সম্মোহিতের ন্যায় তাকিয়ে আছেন। এমন সময় পিঠে এসে লাগলো একঝাঁক বেঈমান বুলেট। তখনো তিনি চেয়ে রইলেন উড়ে যাওয়ার গ্রেনেডটার দিকে। হঠাৎ কমলা রঙের আগুনের বলক আকাশের দিকে উড়ে গেলো, হ্যাঙ্গারে সারিবদ্ধ বিমানগুলোতে যেন আলোর নাচন শুরু হয়ে গেলো।

মুখে ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির হাসি। হাসির সাথে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন কালিমায়ে শাহাদাত। চলে গেলেন শায়খ ইয়াসীনের বাড়ানো হাতের দিকে।

বাকি দুটো দল দুদিক থেকে হামলা করে ইঁদুরগুলোকে তাড়া করে ফিরছেন। পুরো ঘাঁটিটাতেই যেন নরককাণ্ড বয়ে গেছে। এতক্ষণে ইহুদি ব্যাটারা পাল্টা ফায়ার করতে শুরু করেছে।

পিছু হটতে হটতে চার মুজাহিদ সৈকতের দিকে আসলেন। তখনো একে-৪৭ চারটাই অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে। চারজনেই তাকিয়ে দেখলো আল্লাহ তাদের সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। দুশমনদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আশাতীত। পুরো বেস জুড়েই আগুনের হোলিখেলা চলছে।

এই ঘটনা হয়তো কোনও পত্রিকায় আসবে না। কতজন ইঁদুর জাহান্নামে গেলো তাও হয়তো জানা যাবে না। কিন্তু এই হামলা পুরো জারজ রাষ্ট্রটার ভিত নাড়িয়ে দেবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আল্লাহর চার সৈনিক এখন খোলা সৈকতে। মাথার ওপর দিয়ে ব্রাশ করতে করতে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেলো। আকাশের দিকে তাক করে হিশাম একটানা ফায়ার করে গেলো। একেবারে নাগালের বাইরে যাওয়ার আগমুহূর্তে, রোটরব্লেডের কোণায় একটা বুলেট লেগে ঝিক করে উঠলো। তারপরই আগুন ধরে গেলো।

হেলিকপ্টার দিয়ে কাজ না হওয়াতে এবার মিসাইল হামলা চালালো। ওরা চারজনই আহত। তারপরও ফায়ার চালিয়ে যেতে লাগলো। প্রথম তিনটা মিসাইল লক্ষ্যচ্যুত হলো। চতুর্থটা আর ব্যর্থ হলো না। আল্লাহর পথের চার অকুতোভয় আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেলো নিমিষেই।

তারা চলে গেলো আল্লাহর কাছে। কিন্তু পেছনে রেখে গেলো বিশাল এক অনুপ্রেরণা। কাসসাম ব্রিগেডের তরুণদের জন্য শাহাদাতের পয়গাম।

"আমি শহীদ রীম সালেহ রিযাশি। আমার শরীরের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো শ্রেপনেলের মত ইহুদিদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। নিহত ইহুদিদের মাথার খুলি নিয়ে আমি বেহেশতের দরজায় কড়া নাড়ব, এই আমার প্রত্যাশা। কতদিন আমি নিজের আত্মাকে বলেছি:

-"হে আমার আত্মা, ধর্মশত্রু ইহুদিদের যদি সত্যিই ঘৃণা করো, তবে আমার রক্তই আমাকে বেহেশতের পথ দেখাবে।" ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী অপারেশন চালানোর উদ্দেশ্যে সেই স্কুলজীবন থেকেই আমি কত চেষ্টা করেছি এবং কত মানুষের পরামর্শ ও সাহায্য চেয়েছি। অনেক চেষ্টা ও আল্লাহর কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।"

কথাগুলো একজন ফিলিস্তীনি নারীর। অকুতোভয় মহিয়সী আল্লাহর বান্দীর। আত্মঘাতী হামলা চালানোর ঠিক আগে তিনি এই জবানবন্দী দিয়েছিলেন।

২০০৪ সালের ১৪ জানুয়ারি। গাযার উপকণ্ঠ। ইরেজ ক্রসিং চেকপোস্ট। ইসরাঈলের নিরাপত্তা বাহিনী কড়া পাহারায় নিয়েজিত। প্রতিদিন শত শত ফিলিস্তীনি এই চেকপোস্ট পেরিয়ে অপর পাশের ইসরাঈলি ইরেজ শিল্প এলাকায় কাজ করতে যায়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেখানে হাজির হন একুশ বছরের তরুণী, রীম সালেহ আর রিযাশী। ইসরাঈলি নিরাপত্তাকর্মীরা রীমকে থামাল। তল্লাশির উদ্দেশ্যে। তাকে মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে যেতে বলে। রীম বলেন:

-আমি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। আমার পায়ে ধাতব পাত লাগানো আছে। এজন্য মেটাল ডিটেকটরের এলার্ম বেজে উঠতে পারে। তার চেয়ে বরং আমার দেহ তল্লাশি করে দেখা হোক।

সৈন্যরা রাজি হলো। রীমকে অন্য একটি কামরায় নিয়ে গেলো। সেখানে অন্যান্য ইসরাঈলি সৈন্য ও পুলিশ ফিলিস্তীনিদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করছিল। একজন মহিলা দেহতল্লাশিকারী না আসা পর্যন্ত রীমকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলল।

রীম চিন্তা করে দেখলো, আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা সমীচীন হবে না। তখন সঙ্গে থাকা দুই কেজি ওজনের বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিলেন। বিস্ফোরণে তিনিসহ চারজন ইসরাঈলি নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়। একই সাথে আহত হয় আরো সাত ইসরাঈলি ও চার ফিলিস্তীনি।

বিবাহিতা রীম ছিলেন গাযা শহরের এক ধনী পরিবারের সন্তান। রেখে গেছেন স্বামী ও দুই শিশু সন্তান। শাহাদতকালে ছেলের বয়স ছিল তিন বছর আর মেয়ের বয়স মাত্র দেড় বছর।

স্বামীই তাঁকে আত্মঘাতী হামলার আগে হামলাস্থলে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন এই আত্মঘাতী হামলাকে সমর্থন করে এবং ফিলিস্তীনি নারীদেরকে আরো আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেন।

জায়নবাদী ইসরাঈলের বর্বর, রক্তাক্ত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের সুদীর্ঘ সংগ্রামে ফিলিস্তীনি নারীরাই বেশি দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-বঞ্চনা সহ্য করেছেন। রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে তারা হারিয়েছেন স্বামী, সন্তান ও ভাইদের। তাঁদের কাছে এই জীবনে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই বরং তাঁদের কাছে কাম্য।

প্রত্যেক নারীই মা হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং নিজ সন্তানদের মায়ের মমতা, ভালোবাসা ও আদর দিয়ে সারাজীবন জড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ফিলিস্তীনি নারী রীমের স্বপ্ন তা ছিল না। তাঁর অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালোবাসার চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছিল পবিত্রভূমির স্বাধীনতার প্রতি তাঁর দরদ। সীমাহীন নির্যাতনের শিকার স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ। অগণিত মুক্তিকামী ফিলিস্তীনির মৃত্যুর জন্য দায়ী হানাদার ইসরাঈলি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা।

শুধু রীমেরই নয়, বরং প্রায় প্রতিটি মুক্তিকামী ফিলিস্তীনি তরুণ-তরুণীর মধ্যেই এই বোধ কাজ করে। তাঁর মত অকাতরে আত্মত্যাগ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে আরো বহু ফিলিস্তীনি নারীপুরুষ। তাদের কাছে এবং রীমের সন্তানদের কাছে তিনি একজন অনুকরণীয়, অসীমসাহসী ও আত্মত্যাগী বীরাঙ্গনা হিসেবেই বেঁচে থাকবেন।

রীমের ফিদায়ি হামলার যৌক্তিকতা কিংবা হামলার পন্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাতে পারে অনেকেই, কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ তো আর মিথ্যে নয়। কোন চরম পরিস্থিতিতে এবং কী অমোঘ কারণে এক মা তাঁর দুই অবোধ সন্তানের প্রতি অসীম মমতা ও ভালোবাসা উপেক্ষা করে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বিস্ফোরকের প্রচণ্ড আঘাতে অবলীলায় নিজেই নিজের শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে, তা কয়জন ভেবে দেখে!

(কৃতজ্ঞতা 'নেটপোকা')।

জীবন জাগার গল্প : ২৭৭

দাদুর অক্ষেপ

খালিদ ছেলেবেলা থেকেই শহরে থাকে। জন্মও শহরেই। বাবা-মা যতটা সম্ভব তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার চেষ্টাতে কমতি করছেন না। ভালো ভালো বই পড়তে দেন। ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যান। সুন্দর সুন্দর আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এত কিছুর পরও সন্তানের উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা নিয়ে দুজনেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। ছেলে এখন বড় হয়েছে। তারুণ্যের নানান বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

বাবা-মা দুজনে পরামর্শ করে, ছেলেকে কিছুদিনের জন্য গ্রামে পাঠলেন। দাদা-দাদুর সাথে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসুক। দাদা ভালোভাবে দেখেশুনে একটা নাতির ব্যপারে সুপরামর্শ দিতে পারবেন।

নাতি এসে দাদা-দাদুর সাথেই সময় কাটাতে লাগলো। দেখতে দেখতে অনেক দিন থাকা হয়ে গেলো। এবার যাওয়ার পালা। দাদী অনেক আয়োজন করলেন। নাতি তো সবসময় আসে না। দাদা আর নাতি খেতে বসলো। দাদু মজাদার সব খাবারের আয়োজন করেছেন। নাতি সব তরকারি থেকেই একটু-আধটু নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে। দাদীও এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছেন।

সাথে দাদাজান খেতে বসলেও তিনি শুধু তার জন্য বিশেষভাবে রান্না করা ভাতের জাউ-ই খাচ্ছেন। গুরুপাক তার পেটে সয় না। দাদু নাতির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন:

-ভাই! যা খাওয়ার এই বয়েসেই খেয়ে নাও। এই দেখছো না, এই বুড়ো-পেটটা তোমার জোয়ান পেটের মতো যা ইচ্ছা খেতে পারছে না। তরুণ বয়স ও বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে কত পার্থক্য দেখেছো!'

-আচ্ছা দাদু! একজন তরুণ ও একজন বৃদ্ধের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়?

-এই যে দেখতে পাচ্ছো, তুমি ইচ্ছা মতো খেতে পারছো, আর আমি?

-না, দাদাভাই,! আমি জানতে চাচ্ছি, সামগ্রিকভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

-সেটা বলতে গেলে, বলতে হয়, মূল পার্থক্য হলো প্রজ্ঞা আর শক্তিতে। একজন তরুণের ভিতর প্রজ্ঞা বা জ্ঞান কম, কিন্তু শক্তি বেশি। অন্যদিকে, একজন বৃদ্ধের সারাজীবনের অর্জিত প্রজ্ঞা পাহাড়সমান হলেও তার তেমন শক্তি নেই। আর ভিতরে শক্তি না থাকলে প্রজ্ঞা অনেকটাই অর্থহীন।

একটু চুপ থেকে দাদু আবার বলতে লাগলেন:

-তরুণরা অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধরা পারে না। কারণ প্রজ্ঞা আর শক্তির সমন্বয় ঘটালেই অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব। আর প্রজ্ঞা ও শক্তির সমন্বয় কেবল তরুণরাই ঘটাতে পারে, বৃদ্ধরা পারে না।

দাদুর কথা শুনে নাতি বলল:

-আপনি কি তরুণ বয়সে অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছিলেন?

দাদু হতাশ কণ্ঠে বললেন:

-না-রে ভাই, কিছুই পারি নি। তখন আমার ভিতরে প্রজ্ঞা ছিল না। ছিল শুধু আবেগ। আবেগের বশবর্তী হয়ে যা খুশি তাই করেছি। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করি নি। আমার ভিতরে তখন প্রচণ্ড শক্তি ছিল, কিন্তু শক্তির যথার্থ ব্যবহার করতে পারি নি। প্রজ্ঞা ছাড়া তো শক্তির যথার্থ ব্যবহার সম্ভব নয়।

আর বলতে দ্বিধা নেই, তখন অনেকটা বনের পশুর মতো ছিলাম। ভিতরে ছিল না কোনও চারিত্রিক দৃঢ়তা। যৌবনের অপব্যবহার আমাকে তরুণ বয়সে জ্ঞানশূন্য করে রেখেছিল।

দাদুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর নাতি বলল:

-দাদু! আমাকে কি বলতে পারেন, কীভাবে একজন তরুণ প্রজ্ঞাবান হতে পারে?

-একজন তরুণ তখনই প্রজ্ঞাবান হবে, যখন তার ভিতরে কোনও রিপু থাকবে না। মানুষের ভিতর ৬ টি রিপু থাকে, এগুলোকে ষড়রিপুও বলা হয়। এই ৬ টি রিপু হলোঃ

১। কাম। (ব্যাভিচার, বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গকামনা)।
২। ক্রোধ। (রাগ, উত্তেজনার বশীভূত হওয়া)।
৩। লোভ। (পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি)।
৪। মোহ । (বিভ্রম, বিবেকশূন্যতা)।

৫। মদ। (অহংকার, গর্ব, আত্মগৌরব)।

৬। মাৎসর্য। (পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ভালো দেখতে না পারা)।

এই ৬ টি রিপু যদি তোমার ভিতরে না থাকে, তাহলেই তুমি প্রজ্ঞাবান হতে পারবে। অন্যথায় বিশ্বের বড় বড় ডিগ্রিও তোমাকে সামান্যতম জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারবে না।

একথা বলার পর, দাদুর দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। দাদুকে কাঁদতে দেখে নাতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল:

- কাঁদছেন কেন, দাদু ?

দাদু বললেন:

-এখন সবসময় অনুশোচনা হয়। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে একটা কালো রঙের হিংস্র জন্তু আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলে:

-"এই ব্যাটা! আমাকে চিনতে পেরেছিস? আমি তোর হারিয়ে যাওয়া তারুণ্য। আমি তোর যৌবনকাল। তোর জীবনের এক সোনালি সময়ে আমি তোর কাছে এসেছিলাম। কিন্তু তুই আমার সদ্ব্যবহার করিস নি, করেছিস অপব্যবহার। সেই পাপের কর্মফল শুধু ইহকালেই না, পরকালেও ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাক!"

দাদুর কথা শুনে নাতি কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। তার মনে প্রশ্ন জাগল:

-সে যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন তার যৌবনকালও কি তাকে এভাবে ধিক্কার দিবে?

জীবন জাগার গল্প : ২৭৮

পেন্সিলে আঁকা শিক্ষা

বাবা নিজের পড়ার কক্ষে বসে বসে পড়ছেন। ছোট ছেলেটা বল কুড়াতে সেখানে এলো। বাবা ইশারায় ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

-জ্বি, আব্বু!

-দাদুকে ওষুধ খাইয়েছো?

-জ্বি।

-আব্বু, আপনি কী লিখছেন?

-আমি তোমাদের কথা লিখছি। আমাদের কথা লিখছি। পরিবারের কথা লিখছি।

-পেন্সিল দিয়ে কেন লিখছেন? আমার সুন্দর কলমটা এনে দেই? যেটা আপনি সেবার হজ থেকে এনে দিয়েছিলেন?

-না, লাগবে না। ওটা সোনামণি! শুধু তোমার জন্য এনেছি। ওটা দিয়ে তুমি লিখবে। আর আমার কাছে পেন্সিল দিয়ে লিখতেই ভালো লাগে। একটা কথা কি তুমি জানো?

-কী কথা আব্বু?

-এই যে লেখার পেন্সিল, সেটা কিন্তু আমার লেখাগুলোর চাইতেও দামী। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি বড় হয়ে একদিন এটার মতই হবে।

বাবার অবাক করা কথা শুনে, ছেলে কৌতূহলী হয়ে ওঠল। সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পেন্সিলটা লক্ষ্য করলো, কিন্তু সেটাতে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছুই তার চোখে পড়ল না ।

- 'আব্বু! এটা তো আমার দেখা আর সব পেন্সিলের মতই সাধারণ !'

-'সেটা নির্ভর করে তুমি কিভাবে পেন্সিলটাকে দেখছ।' পেন্সিলটার মাঝে পাঁচটি এমন গুণ আছে । যে গুণগুলো তোমার জীবনে আনতে পারলে তুমি পৃথিবীতে একজন সুখী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে।

-আচ্ছা! গুণগুলো কী আব্বু?

প্রথম গুণঃ

-তুমি জীবনে এক সময় অনেক বড় কিছু করবে, কিন্তু কখনোই একথাটা ভুলে যাবে না যে, পেন্সিলের মত তোমাকেও একটা হাত পরিচালনা করে। এই হাতকেই আমরা স্রষ্টা হিসেবে চিনি । তিনি তার নিজের মত করে আমাদের পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় গুণঃ

-লেখার সময় আমাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়। পেন্সিলকে শার্পনার দিয়ে ধারালো করে নিতে হয়। এতে পেন্সিলের কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য জীবনে কিছু কষ্ট সহ্য করতে শেখ; এই কষ্টগুলোই তোমাকে আরোও উন্নত করে তুলবে, সাফল্য এনে দিবে ।

তৃতীয় গুণঃ

-লেখার সময় পেন্সিলের ভুলত্রুটি হতেই পারে। পেন্সিলের লেখা সহজেই রাবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়। এটা থেকে বুঝে নিও, আমরা যদি ভুল করেই ফেলি, সেটা ঠিক করাটা দোষের কিছু নয় । বরং সংশোধন করেই সঠিক পথে টিকে থাকা যায়।

চতুর্থ গুণঃ

-একটা পেন্সিলের বাইরে কাঠ। এই কাঠের আবরণের নিচেই লুকিয়ে থাকে পেন্সিলের আসল বস্তু। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ; বাইরের চাইতে ভেতরের সৌন্দর্যটাই আসল। তোমার ভেতরের উন্নতির দিকে সবসময় লক্ষ্য রেখো।

পঞ্চম গুণঃ

-পেন্সিল তার দাগ রেখে যায় সবসময়। তুমিও যা কিছু কর, তার চিহ্ন থেকেই যাবে । তাই তোমার প্রতিটি কাজ করবে দায়িত্ব নিয়ে। চিন্তা-ভাবনা করে।

জীবন জাগার গল্প : ২৭৯

আঁল্লাইকুম আব্বা!

সেই কাপ্তাই থেকে ফিরছি। বাসে উঠে বসলাম। বাস ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই।

আমার সামনে সারিতে দুজন চাকমা মহিলা বসা। কী একটা কথা নিয়ে তারা এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ দেখি একটা লোক বাসে উঠলো। পোশাকাশাকে বোঝাই যায় একজন পেশাদার ভিক্ষুক। শরীরটা একদম শীর্ণ। টিঙটিঙে তালপাতার সেপাই। দুবলা-পাতলা।

নিরীহ গোবেচারা ভাব। ড্যাবড্যাবে দৃষ্টি।

গলার কণ্ঠনালি বের হয়ে আছে। হাড়গিলে।

কোটরাগত চক্ষু। মনে হয় প্রাণপাখি বের হয়ে যেতে পারে। ফুঁ দিলেই ফুড়ুত করে উড়ে যাবে।

লোকটা বাসে উঠে একটু ইতস্তত করছিলো। তারপর হঠাৎ, সামনের সারিতে বসা দুই চাকমা মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললোঃ

আঁল্লাইকুম আম্মা! আঁরে হিসু দন!

(আস্লাইকুম, আম্মা! আমাকে কিছু দিন।)

লোকটা এমন চিঁহিঁ নাকি আর খোনা সুরে কথাটা বলে উঠলো যে মহিলা দুজন চিৎকার করে বলে উঠলোঃ

-ও মাদু! মোগোদা বাঁ-ললো!

(ওরে বাবারে! ব্যাটা বাঙাল!)।

ওদের দুজনের চীৎকারে পুরো বাস কী হলো কী হলো করে উঠলো।

এমন পিলে চমকানো কাণ্ড ঘটানোর পরও লোকটার মধ্যে কোনও বিকার দেখলাম না।

যেন কিছুই হয়নি, আমার কাছে এসে বললোঃ

আঁল্লাইকুম আব্বা! আঁরে হিসু দন!

ওদিকে পুরো বাস হাসতে হাসতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জীবন জাগার গল্প : ২৮০

ভাঙ্গা-গড়া

আক্কাস আলী একজন খলীফা। তার দোকানের নাম আক্কাস টেইলার্স। দোকানের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

–পোশাক আপনাকে সুন্দর বানায়।

আমরা পোশাককে সুন্দর বানাই।

দোকানের সামনে দিয়ে নতুন কেউ হেঁটে গেলে, লেখাটা পড়ে থমকে দাঁড়ায়। মুগ্ধ হয়ে কথাটা বারকয়েক মনে মনে আওড়ায়।

আক্কাস আলীর একটাই ছেলে, নাম রমজান আলী। ছেলেকে ভালোভাবে সেলাই শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলে এখন ঢাকায় বড় এক টেইলার্সে চাকরি করে।

এখন আক্কাস আলীর সাথে দোকানে থাকে নাতি মোবারক আলী। নাতিকে হাতে-কলমে সব শিখিয়ে দিচ্ছে। নাতিও যাতে বাপ-দাদার মতো করে খেতে পারে। নাতি তীব্র কৌতূহল নিয়ে দাদার কাজকর্ম লক্ষ্য করে। দাদাজান কখন কী করেন, কিভাবে করেন গভীর মনোযোগের সাথে খেয়াল রাখার চেষ্টা করে। নাতি মোবারক লক্ষ্য করে দেখলো:

-দাদাজান কেঁচি দিয়ে নতুন নতুন কাপড়গুলোকে ছোটবড় বিভিন্ন আকারে টুকরো টুকরো করে কাটছেন। কাপড় কাটার পর, কেঁচিটা অবহেলাভরে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখছেন।

এরপর মোবারক লক্ষ্য করে দেখলো, দাদাজান সুই-সুতা হাতে নিলেন। এতক্ষণ ধরে কাটা কাপড়গুলো সেলাই করতে শুরু করলেন। কাপড়ের টুকরাগুলো কিছুক্ষণ পর সুন্দর এক জামায় পরিণত হলো।

সেলাই শেষ হলে, দাদাজান সুইটা মাথার পাগড়ির মধ্যে গেঁথে রাখলেন। মোবারক অবাক হয়ে জানতে চাইলো:

-দাদাজান! আপনি এত দামি ও সুন্দর একটা কেঁচিকে নিতান্ত অবহেলাভরে পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেললেন আর পুঁচকে-নগণ্য একটা সুইকে মাথায় তুলে রাখলেন?

জীবন জাগার গল্প : ২৮১

খাটিয়ার লাশ

দেখা করতে যাবো মুফতি রিযওয়ান সাহেবের সাথে। প্রফেসর হামীদুর রাহমান সাহেবের বড় ছেলে। সময় দিয়েছেন ইশার পর। নামায আদায় করলাম শ্যামলি শাহী মসজিদে। গেইট দিয়ে প্রবেশ করতেই ডান পাশে একটা জটলা চোখে পড়লো।

ব্যাপারটা কি দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। একজন কৈশোর পেরুনো ছেলে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কয়েকজন যুবক।

পাশেই একটা খাটিয়া রাখা। ছেঁড়া একটা কাঁথা দিয়ে একটা লাশ ঢাকা দিয়ে খাটিয়ার ওপর রাখা আছে। ছেলেটার বড় ভাই মারা গেছে। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ভাড়া নেই। ঢাকাতে ছেলেটার কোনও আত্মীয়ও নেই। বড় ভাইয়ের ওপর ভরসা করেই সে ঢাকা এসেছে। কিভাবে লাশ নিতে হবে সে জানে না। আশেপাশের কয়েকজন বুদ্ধি দিয়েছে, মৃত ভাইকে মসজিদে নিয়ে আসতে। সে তাই করেছে।

এরপর কী করতে হবে, সে বুঝে উঠতে পারছে না। এই প্রথমবার ঢাকা আসা। ভাই রিকশা চালাতো। ছোট ভাইকেও রিকশা চালানোর তালীম দিচ্ছিলো। ঘরে আছে বৃদ্ধ বাবা-মা। বাবা অন্ধ। কথা ছিলো এবার কুরবানির ঈদের সময় বাড়ি গেলে বাবা-মাকেও ঢাকা নিয়ে আসবে। বাবার চোখের ছানি কাটাবে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো।

ভাইয়ের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে ছিলো। গার্মেন্টসে কাজ করে মেয়েটা। সবই শেষ হয়ে গেলো।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। মানুষের এত কষ্ট কেন? মানুষ এত অসহায় কেন? মানুষ এত নিরুপায় কেন?

এ ধরনের হাজানো প্রশ্ন এসে মাথায় ভর করলো। নামায শেষে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করে গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালাম। বিবেক বারবার প্রশ্ন করছিলো:

-সামান্য একশ টাকার একটা নোট দিয়েই দায়িত্ব সারলে? এর বেশি চাইলে কি তুমি করতে পারতে না?

জীবন জাগার গল্প : ২৮২

গানপাগল মেয়ে

শায়খ হাম্মাদ একটা ঘটনার বলেছেন। ঘটনাটি তার মহল্লার। তিনি বললেন:

-একদিন মসজিদে বসে আছি। ফজরের পরে। একটি ছোট ছেলে এলো। আমাকে বললো:

-আমাদের বাসায় একটু যেতে পারবেন? আব্বু বলেছেন যদি আপনার কষ্ট না হয়, তাহলে বাসায় আসতে।

-ঠিক আছে চলো।

বাসায় গেলাম। মসজিদের অদূরেই বাসাটা। দরজাতে ছেলের পিতা আমাকে স্বাগত জানালেন। ভিতরে গিয়ে বসলাম। বাবা বললেন:

-শায়খ! আমার মেয়েটা খুবই অসুস্থ। গতরাত থেকে কেমন যেন করছে। কয়েক বার বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। মেয়ের মা বারবার তার কানের কাছে কালিমা পড়ছে। কিন্তু মেয়ে কী যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না।

আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম আপাদমস্তক আবৃত একটা মানুষ শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে কালিমার তালকীন দিলাম:

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

বেশ কয়েকবার বলার পরও মেয়েটার কাছ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না। এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমার মনে হলো, চাদরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আসছে। মেয়ের বাবাকে বললাম:

-আপনি কান পেতে শোনার চেষ্টা করুন তো। বোঝা যায় কি না দেখুন।

বাবা মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন। অনেকবারের চেষ্টায় তিনি উদ্ধার করতে পারলেন, মেয়ে বলছে:

-আমি কিছু বলতে পারছি না। আমার জিহ্বাটা কে যেন কালিমা বলতে গেলে ধরে রাখে । আহ! আমার বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। বুকের ওপর ভীষণ চাপ অনুভব করছি। আহ! আমি দেখতে পাচ্ছি অদূরেই একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড দাউদাউ করে জ্বলছে।

এসব বলতে বলতে মেয়েটার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। আমি মেয়ের বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম:

-মেয়েটার জীবন কিভাবে কাটতো? সে কী করতো?

-শায়খ! আমার মেয়েটা খুবই ভালো মেয়ে। পড়ালেখা, আচার-আচরণ সবদিক থেকেই সে সেরা একটা মেয়ে। কিন্তু তার একটা সমস্যা আমরা বাবা-মা দুজনেই, হাজার চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারি নি।

-কী সেটা?

-সে দিনের বেশির ভাগ সময়ই কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতো। ওর নাকি গান না শুনলে ভালো লাগতো না। এমনকি ও পড়ার সময়ও কানে গানের হেডফোন লাগিয়ে রাখতো। এই গানের কারণে তার নামাজ-তিলাওয়াতেও অনেক সময় ঘাটতি হতো। এই একটা কাজই সে আমাদের বারণ ঠেলে করতো।

-আমার মনে হয়, এই পাপেই তার মুখে শেষ মুহূর্তে কালিমা নসীব হয় নি।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে হারাম গানের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৩

চাকার বাতাস

স্কুল থেকে শিক্ষা সফরে যাওয়া হবে। সব ঠিকঠাক করা হলো, গোছগাছ করা হলো। সবাই যে যার নির্দিষ্ট আসনে বসে গেলো। বাস ছেড়ে দিল। ছোট ছোট ছেলেদেরকে আগেই সতর্ক করে দেয়া হলো:

-সামনে একটা সুড়ঙ্গ পথ আসবে। বেশ লম্বা। সুড়ঙ্গ পথের ভেতরটা পুরোপুরি আলোকিত নয়। তোমরা ভয় পাবে না। চুপচাপ বসে থাকবে। বাস খুব তাড়াতাড়িই সুড়ঙ্গটা পার হয়ে যাবে।

বাসের চালক অভিজ্ঞ। এই পথে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছে। অন্য চালকরা যেখানে সুড়ঙ্গে মুখে এসে গতি একটু কমাচ্ছে, সেখানে স্কুলবাসের চালক আগের গতিতেই বাস চালিয়ে, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলো। বেশ ভালোই চলছিলো। বিপত্তি বাধলো সুড়ঙ্গের মাঝামাঝিতে এসে। কির কিরর করে গা শিউরানো আওয়াজ তুলে বাসের ছাদটা সুড়ঙ্গের ছাদের সাথে লেগে গেলো।

হড়কে হড়কে কিছুদূর যাওয়ার পর বাসটা থেমে গেলো। চালক গিয়ার বদলে দেখলো, বাসটাকে নড়ানো গেলো না। আবার স্টার্ট দিয়ে পিছন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো তাও সম্ভব হলো না।

বাসের ভেতরে শিশুরা চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। কয়েকজন তো ভয়ে উচ্চগ্রামে কাঁদতে শুরু করলো। বড় বড় ছাত্ররা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েও বাসটাকে একবিন্দুও স্থানচ্যুত করতে পারলো না। পেছনে অনেক গাড়ি এসে জমা হয়ে গেলো। পেছনের গাড়ির সাথে রশি বেঁধে টানা হলো নাড়ানো গেলো না। বামের লেন ধরে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা গাড়ি দিয়ে সামনের দিকে টানার ব্যবস্থা করা হলো, উঁহু! গাড়ি নড়লো না। রশিটাই ছিঁড়ে গেলো।

এক কঠিন অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। পেছন দিকে গাড়ির লাইন ক্রমশঃ লম্বা হচ্ছে। কিন্তু কোনও সমাধান বের করা যাচ্ছে না। গাড়ির চালক খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো:

-রাস্তাটা কিছুদিন আগে, নতুন করে বাঁধানো হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে। সুড়ঙ্গের ভেতরে পানি জমে থাকার কারণে রাস্তা কিছুটা উঁচু করা হয়েছে। তাতেই এই ঝামেলা হয়েছে। রাস্তার উচ্চতা আর গাড়ির উচ্চতা মিলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সবাই গাড়ির বাইরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন প্রস্তাব দিলো:

-বাসের নিচের পাথর সরিয়ে দেখলে কেমন হয়? বাসটা একটু নিচু হবে। তাহলে গাড়িটা চলতে পারবে। ছাদের সাথে ঘষা খাবে না।

সবাই এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললো:

-এটা কি করে সম্ভব? তাহলে তো পুরো সুড়ঙ্গটাই খুঁড়তে হবে। না হলে, যতটুকু খোঁড়া হবে, ততটুকুই বাস এগুবে, তারপর তো আটকে যাবে। নাহ, এটা কোনও কার্যকর সমাধান নয়।

একটা ছেলে গাড়ি থেকে নেমে এসে বললো:

-একটা সমাধান আমার মনে এসেছে।

বড়রা সবাই ছেলেটা ধমক দিয়ে গাড়িতে পাঠিয়ে দিলো। এই ছোটরা, কেউ বাস থেকে নামবে না বলছি। কিছুক্ষণ ছেলেটা আবার নেমে এসে বললো:

-আমার কথাটা একবার শুনুন! ছোট বলে অবহেলা করবেন না। বিশাল বড় একটা বেলুনকে ছোট্ট একটা সুইও চুপসে দিতে পারে। বিশাল এক হাতিকে পুঁচকে একটা পিঁপড়াও ধরাশায়ী করতে পারে।

-ঠিক আছে বাবা, বলো কী বলতে চাও।

-গত বছর আমাদের স্কুলে যে বার্ষিক মাহফিল হয়েছিলো, সেখানে আমাদের হুযুর স্যার একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

-আমাদেরকে যদি শত্রুরা একটা ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে, আর সে ঘরের দরজাটা খুবই সংকীর্ণ হয়, তাহলে কিভাবে এই সংকীর্ণ দরজা দিয়ে বের হবো?

হুযুর প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছিলেন:

–আমাদেরকে গায়ের অতিরিক্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলতে হবে। শরীরকে যতটা সম্ভব বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, চিকন করে দরজা পার হতে হবে।

তেমনি ভাবে আমাদের মনটাও অনেক সময় মোটা হয়ে যায়। ফুলে ঢোল হয়ে যায়। এত বেশি মোটা যে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের উপযুক্ত থাকে না। এখন বলো দেখি, মনটা কিভাবে ফুলে যায়?

আমিই বলে দিচ্ছি:

-মনটা ফুলে, অহংকারের বাতাসে। দম্ভের বাতাসে। এই ফোলা মন নিয়ে, এই অহংরাস্ফীত অন্তর নিয়ে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। এখন কী করতে হবে? তোমাদের মনে যে অহংকার আর দম্ভের বাতাস আছে সেটাকে ফুটো করে বের করে দিতে হবে। তাহলে মনটা চুপসে যাবে। তখন জান্নাতে সহজে প্রবেশ করতে হবে।

এরপর ছেলেটা বললো:

-আমরা যদি হুযুরের নসীহতটা বাসের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাই, আমার মনে হয় কাজ হতে পারে।

-কিভাবে?

-এটা তো সহজ, আমরা বাসের চাকার বাতাস কিছুটা ছেড়ে দিলে, বাসের ছাদটা একটু নিচে নামবে। আমরাও এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবো। পেছনে আটকে পড়া গাড়িগুলোও মুক্তি পাবে।

ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মনের বাতাস (অহংকার) বের করে দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৪

বিশ্ব সুন্দরী

আর রীশ। একটা বিউটি পার্লার। ছোট শহর 'খিবার'-এ সাকুল্যে এই একটাই পার্লার। এখানেই মেয়েরা ভীড় জমায়। তাদের পিছুপিছু কিছু উঠতি যুবকও 'আর রীশে'র আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে।

এই যুবকের দল প্রথম প্রথম চুপচাপ বসে থাকতো। আস্তে আস্তে শিস দিতে শুরু করলো। এরপর সামনে এসে দাঁড়ানো শুরু করলো। এরপর কথা বলার চেষ্টা শুরু হলো।

ছোট্ট নিস্তরঙ্গ শহরে, এ নিয়ে কথা হতে লাগলো। মুরুব্বিরা ভাবলেন, এর একটা বিহিত করতে না পারলে বিষয়টা আস্তে আস্তে সীমার বাইরে চলে যাবে।

তারা পরামর্শ করে শহরের বড় মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলো। ইমাম সাহেব বললেন:

-এজন্য সুযোগ মত উভয় দলকে নিয়ে একবার বসতে হবে। ছেলেদেরকে তো জুমু'আর দিন পাওয়া যাবে। মেয়েদেরকে একদিন বিউটি পার্লারে গিয়েই দ্বীনের কিছু কথা শোনানো যায় কিনা দেখতে হবে।

ইমাম সাহেব এক উৎসবের আগের রাতে আরো কয়েকজন মুরুব্বি সহ 'আর রীশে' গেলেন। মালিকের অনুমতি নিয়ে, তিনি সাজঘরের এপাশ থেকে মেয়েদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বললেন:

-বোনেরা! তোমরা এখানে আসো নিজেকে সুন্দর করার জন্য। নিজেরে সুন্দর করার চেষ্টা করা ভাল। আল্লাহও সুন্দরকে পছন্দ করেন।

-তো বোনেরা! তোমরা কি বিশ্বের সেরা সুন্দরী হতে চাও?

-জ্বি চাই।

-আবার আখিরাতেও সেরা সুন্দরী হিসেবে গণ্য হতে চাও?

-জ্বি চাই।

-তাহলে তোমাদেরকে পাঁচ প্রকারের মেকাপ নিতে হবে।

এক: তোমরা ভ্রু প্লাক করো। ভ্রুর পশম উপড়ে ফেলে সেটাকে চিকন করো। এজন্য তোমরা সূক্ষ্ম চিমটা ব্যবহার করো।

ঠিক এভাবে তোমাদেরকে গুনাহর পশম তুলে ফেলতে হবে তাওবার চিমটা দিয়ে।

দুই: তোমরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানান ডিজাইনের পোশাক পরো। তদ্রুপ আল্লাহর চোখে পড়ার জন্য তোমাদেরকে সহনশীলতা, ধৈর্যের পোশাক পরতে হবে।

তিন: তোমরা নিজের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আতর- সেন্ট- পারফিউম ব্যবহার করো। এভাবে তোমার সুবাস চারদিকে, ছড়িয়ে পড়ার জন্য তুমি ঈমানের আতর ব্যবহার করো।

চার: তোমরা নানা রঙের সানগ্লাস পরো। যেন তোমাকে মোহনীয় দেখায়। তুমি বেগানা পুরুষদের না তাকিয়ে, নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখার চশমা পরতে পারো। পাশাপাশি বেগানা পুরুষদের চোখেও এই চশমা পরার ব্যবস্থা করতে পারো।

-সেটা কিভাবে?

-তুমি পর্দা করার মাধ্যমে, নিজেকে তাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখো। তাহলেই হবে।

পাঁচ: তুমি মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য নানা রকমের মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করো। এর পাশাপাশি তুমি ইস্তিগফারের মিসওয়াক ব্যবহার করতে শেখো।

এই মেকাপগুলো যদি তুমি নিয়মিত নিতে পারো, তাহলে তুমি হয়ে যাবে শুধু দুনিয়ার নয়, আখিরাতেরও সেরা সুন্দরী।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীনকে মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৫

চোরাচালান

সীমান্ত এলাকা।

এক লোক প্রায় প্রতিদিনই, সাইকেল চালিয়ে যায়।

সাইকেলের পেছনে কেরিয়ারে বড় একটা বস্তা থাকে।

সীমান্তরক্ষীরা সব সময় তার বস্তা তল্লাশি করে দেখতে পায় বস্তার ভেতরে ঘাস।

-তুমি কী নিয়ে যাচ্ছো?

-দেখতেই পাচ্ছেন স্যার, গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাস নিয়ে যাচ্ছি।

এভাবে চলতে থাকলো। লোকটা প্রতিদিন ঘাসের বস্তা নিয়ে আসা-যাওয়া করে।

রক্ষীরা অনেক খুঁজেও কিছুই পায় না।

একটা সময় পর লোকটাকে আর দেখা গেলো না।

বহুদিন পর, সীমান্তের এক সৈন্য সিভিল ড্রেসে বাজারে এলো। দেখলো ঐ ঘাসওয়ালা লোকটা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

-এই যে ভাই! শুনুন?

-কী

-আপনিই তো অনেক আগে, সীমান্তে এপার-ওপার ঘাসের বস্তা আনা-নেয়া করতেন?

-জ্বি।

-আচ্ছা বলুন তো, আমরা সবাই নিশ্চিত ছিলাম, আপনি কিছু একটা চোরাচালানে পাচার করেন। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারিনি। আপনি আসলে কী পাচার করতেন?

-সাইকেল।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৬

স্বর্ণের লোভে

বিশাল জাহাজ। এক প্রমোদতরী। আরোহীরা সবাই গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। সাগরের বুকেই এবার ছুটিটা কাটাবে। আরামে-আয়েশে। ভোগে-বিলাসে।

জাহাজ চলতে লাগলো সাগরের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ ভেঙে। যতই গভীর সমুদ্রের দিকে চলছে, আরোহীদের হাসি-উল্লাস বেড়েই চলছে। একদিন রাত বারোটার সময় সবাই যখন বারে মদমত্ত অবস্থায় বেসামাল হয়ে আছে, তখন জাহাজের পাগলাঘণ্টি বেজে উঠলো।

প্রথম প্রথম কেউ তেমন পাত্তা দিলো না। ঘণ্টির আওয়াজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো। মাইকে ঘোষণা দেয়া হলো:

-জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যাবে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় জাহাজের নিচটা ফুটো হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও মেরামত করা যাচ্ছে না। গলগল করে পানি ঢুকছে। আগে থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি।

পুরো জাহাজ জুড়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। কে কার আগে নামবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। জাহাজের সমস্ত বোট নামিয়ে দেয়া হলো। সবাইকে একটা করে লাইফ জ্যাকেট দেয়া হলো।

যতটুকু সম্ভব খাদ্যদ্রব্য নেয়া হলো। প্রবল বৃষ্টি ও কুয়াশার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনরুমে আগেই পানি ঢুকে পড়াতে জাহাজকে নড়ানো গেলো না।

খাদ্যদ্রব্যের বাইরে অন্য কিছু নেয়ার সুযোগ হলো না। যোগাযোগের জন্য কয়েকটা ওয়্যারলেস সেট যাওবা নেয়া গেছে, পানির ছলকে সেগুলোও অকেজো হয়ে পড়েছে।

বোটগুলো চলতে চলতে একটা দ্বীপে গিয়ে ঠেকলো। সামানপত্র নামানো হলো। দ্বীপটা ছিলো জনমানবশূণ্য। পাহাড়-পর্বতবহুল। কিছুটা সমতল ভূমিও আছে।

বোটে করে পর্যাপ্ত খাবার নিয়ে আসা হয়েছিলো। সেজন্য এই দ্বীপে থাকতে কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। কিন্তু সবাই মিলে পরামর্শ করলো, এভাবে চলতে থাকলে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়। আমরা চাষাবাদের ব্যবস্থা দেখি।

এরপর থেকে একদল চাষাবাদের কাজে লেগে গেলো। বীজ বোনার সময় হলে আরেকদল লোক এসে বললোঃ

-আমাদেরকে আর চাষাবাদ করে কষ্ট করতে হবে না। দ্বীপের দক্ষিণ পাশে বিরাট এক স্বর্ণখনি পাওয়া গেছে। সবাই চলে গেছে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে। তোমরাও চলো। সবাই চাষাবাদ রেখে খনিতে চলে গেলো।

প্রতিদিন সবাই সকাল-সন্ধ্যা স্বর্ণ আহরণে মশগুল থাকলো। এদিকে খাবার ফুরিয়ে আসলেও কারো এ ব্যাপারে মাথাব্যথা ছিলো না। সবাই স্বর্ণ নিয়ে বিভোর।

এই করতে করতে শীত এসে গেলো। জমিতে বীজ বোনার সময় পার হয়ে গেলো। প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলো। খাবার তো আগেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। তুষারপাতে আটকা পড়ে, কয়েকদিনের মধ্যে বাকি খাবার শেষ হয়ে গেলো। সবার কাছেই গাদা গাদা স্বর্ণপিণ্ড। ক্ষুধা নিবারণে সেটা কোনও কাজে এলো না। সবাই চাষাবাদ না করার জন্য দিনরাত আফসোস করতে লাগলো।

সবাই বন্দী জীবন কাটানো অবস্থাতেই আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়তে শুরু করলো। ক্ষুৎ-পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়লো। স্বর্ণের লোভে চাষাবাদও করে নি। বাড়তি কোন খাবারের যোগানও নেই। একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো।

শীত কেটে গেলে দেখা গেলো আর কোনও জীবিত মানুষ অবশিষ্ট নেই।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৭

তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত

ট্রেন চলছে দ্রুতবেগে। প্রতিটি বগিই যাত্রীতে ভর্তি। একটা বগিতে দেখা গেলো চারটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। পুরো বগি জুড়ে ছোটাছুটি করছে। চীৎকার-চেঁচামেচি করে কান ঝালাপালা করে ফেলছে।

পাশের আসনেই তাদের পিতা চুপচাপ বসে আছে। ছেলেরা এতকিছু করছে পিতার নির্বিকার হয়ে আছে। সহযাত্রীরা বিরক্ত হচ্ছিল। কিন্তু কেউ কিছু বলছিলো না। ছেলেদের ছোঁড়া বলটা এর ওর গায়ে এসে পড়ছিলো। এত কিছু হয়ে যাচ্ছে তবুও বাবা বেচারা কিছুই বলছে না। ছেলেদের দিকে উদাস একটা ভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে আবার জানালার দিকে মুখ করে বসছে।

বগির এক কোণে একটা খিটখিটে বুড়ো বসা ছিলো। আর থাকতে না পেরে বুড়োটা লাঠি ঠকঠক করে এগিয়ে এলো। বুড়ো এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ফুলছিলো। গজগজ করে বলছিলো:

-এ কেমন বাবা, ছেলেদেরকে একটুও শাসন করছে না। অন্যদেরকে বিরক্ত করে মারছে, সামান্য হলেও তো ডাক দিতে পারে। সামলে-সুমলে রাখতে পারে।

বুড়ো লোকটা বাবার সামনে এসে রাগে ফেটে পড়লো।

-কিরে মিয়াঁ! আপনার ছেলেদের জ্বালাতনে অস্থির হয়ে পড়েছি। পুরো বগিটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। একটু শান্তিতে বসে বসে ঝিমুবো সে কুদরত নেই। মাথাটাই পাগল করে দিলো।

বাবা লোকটা বুড়োকে একপাশে টেনে নিয়ে বললো:

-চাচাজান! আপনি যেটা বলছেন সেটা আমিও করতে চাচ্ছি। কিন্তু মন থেকে সায় পাচ্ছিলাম না।

-কেন?

-গতরাতে তাদের মা মারা গেছে। ছেলেরা বাড়িতেই ছিলো। তাদের মা গিয়েছিলো বাপের বাড়িতে। সেখানেই একটা সাপ তাকে দংশন করেছে। খুবই বিষাক্ত সাপ। বেচারি বেশিক্ষণ বাঁচে নি।

আমি ভেবে কুলকিনারা করতে পারছি না, এই মা'সুম বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের মৃত্যুর কথা দিই কিভাবে? তারা এত আনন্দে খেলাধূলা করছে, এখনি যদি খবরটা দিই তাহলে তাদের সব হাসি-আনন্দ সব মাটি হয়ে যাবে।

তাই ভাবলাম, খবরটা যত পরে দেয়া যায় ততই তাদের জন্য ভালো। খেলুক না আরেকটু। খবরটা দিলেই তো তাদের জীবনে নেমে আসবে ঘোর অন্ধকার।

জীবন জাগার গল্প : ২৮৮

বয়

দোকানে নাস্তা করতে বসলাম।

জমজমাট হোটেল। খদ্দেরে গিজগিজ করছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা আসন পেয়েছি। বসার পর শুনলাম পাশের টেবিল থেকে একজন জোরে হাঁক দিলো:

-এই এদিকে আয়।

-একজন ছোট বয় এগিয়ে এলো।

-ধর, গ্লাসটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আয়। আমি তাকিয়ে আছি। বয় গ্লাস নিয়ে চলে গেলো। একটু পর ঝকঝকে পানিভর্তি গ্লাস নিয়ে এলো।

লোকটাকে দিতে গিয়ে হাত ফসকে গ্লাসটা পড়ে গেলো। লোকটার শার্ট-প্যান্ট ভিজে একসা।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলো।

গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেলো। এটা দেখে ম্যানেজার যেন উড়ে এলো। এত জোরে ছেলেটাকে মারলো, ছেলেটা একদম মাটিতে পড়ে গেলো।

আর সেকি খিস্তি! তুফান মেইল বেগে গালি-গালাজ চলতে লাগলো। দুজনেই, সমানে চালিয়ে গেলো।

আমরা মানুষরা এমন কেন?

জীবন জাগার গল্প : ২৮৯

সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের চক্র

চীনদেশের এক বৃদ্ধ লোক। তার একটি শাদা আরবি ঘোড়া ছিলো। ঘোড়াটার প্রতি আশেপাশে সবার লোলুপ দৃষ্টি ছিলো। তারা বৃদ্ধকে গোপনে ঈর্ষা করতো। এমন একটা ঘোড়া তাদেরও কেন হলো না।

একদিন ঘোড়াটা বনে পালিয়ে গেলো। পাড়া-প্রতিবেশী সবাই কাঁদো-কাঁদো মুখে সান্ত্বনা দিতে এলো। সবাই বললো:

-ইশ! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিইবা হতে পারে? এত সুন্দর ঘোড়াটা পালিয়ে গেলো?

বুড়ো ঝামটা দিয়ে বললোঃ

-ঘোড়া পালিয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্য এটা তোমাদের কে বললো? তোমরা কি ভবিষ্যত দেখতে পাও?

সবাই বিরস মুখে ফিরে গেলো। ওরে বাবা! কোথায় আমরা সান্ত্বনা দিতে গেলাম, আমাদেরকে পান-তামাক খাওয়াবে, তা না, উল্টো আরো ঝাড়ি মারছে। মিনসে বুড়ো কোথাকার!

কিছুদিন পর দেখা গেলো, সেই ঘোড়াটা বন থেকে ফিরে এসেছে। শুধু ফিরেই আসে নি। সাথে করে আরো দুই বুনো ঘোড়া নিয়ে এসেছে।

আবার সবাই বুড়োর কাছে এলো। তারা বুড়োকে বাহবা দিতে লাগলো।

-আহ! এমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়?

-কে বলেছে তোমাদেরকে এটা একটা সৌভাগ্য? তোমরা গায়েব জানো?

কিছুদিন পর, বুড়োর বড় ছেলে, একটা বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়তে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে পা ভেঙে ফেললো।

আবার সবাই এলো। আহা-উহু করতে লাগলো। বুড়োকে প্রবোধ দিতে লাগলো।

-ইশ! কতবড় দুর্ভাগ্য। এমন জোয়ান ছেলে পা-টা ভেঙে ঘরে বসে আছে। দেখলেই মনটা কেমন করে উঠে।

-তোমাদেরকে কে বলেছে এটা একটা দুর্ভাগ্য? তোমরা কি গায়েব জানো?

কিছুদিন পর পাশের রাজ্যের সাথে যুদ্ধ লাগলো। দেশের রাজা বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত যুবককে যুদ্ধে যোগ দিতে বললেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের সবার যুবক সন্তান যুদ্ধে গেলো। তাদের অনেকেই যুদ্ধে মারা পড়ল। বৃদ্ধের ছেলেটা ভাঙা পায়ের কারণে বেঁচে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ২৯০

গাছের তলায়

হাশিম বন্ধু আলীর বাড়িতে গেলো। গোটা বাড়ি খুঁজেও আলীর সন্ধান পেলো না। পুরো গ্রাম চষে ফেললো। শেষে দেখতে পেলো নদীর তীরে একটা গাছের নিচে আলী বসে আছে। কাছে গিয়ে বললো:

-কি ব্যাপার আলী! এখানে কী করছো? আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

-কেন কী হয়েছে?

-আমি কয়েক মাসের জন্য, দূরের এক দেশে সফরে যাবো। সময় আরো বেশিও লাগতে পারে। যাওয়ার আগে তোমার কাছে আমার কিছু টাকা আমানত রেখে যেতে চাই। খালি ঘরে টাকাগুলো রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়।

হাশিম সফর থেকে ফিরে এসে টাকা ফেরত চাইল। আলী সরাসরি অস্বীকার করলো। হাশিম বললো:

- কেন তোমার মনে নেই, সেই যে নদীর তীরে, গাছের নিচে তোমাকে টাকাটা দিয়েছিলাম?

-নাহ, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

হাশিম গিয়ে কাযির কাছে বিচার দিলো। কাযি দুজনকেই ডাকালেন। আলী আবারও অস্বীকার করলো। সে কোনও গাছের তলায় কখনো হাশিমের সাথে বসে নি।

কাযি সাহেব তখন হাশিমকে বললেন:

-তুমি একটু সেই গাছের তলায় গিয়ে বসো।

আর আলীকে বললেন:

-তুমি হাশিম ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

এরপর কাযি সাহেব অন্য আরেকটা বিচার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলীর দিকে ফিরেও তাকালেন না। অনেকক্ষণ পর, হঠাৎ করে আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন:

-তোমার কি মনে হয় আলী! হাশিম এতক্ষণে সেই গাছের তলায় পৌঁছেছে?

-জ্বি না। পৌঁছে নি। সেটা তো এখান থেকে অনেক দূরে।

এবার কাযি সাহেব বললেন:

-আচ্ছা! তাহলে তুমি সেই গাছটা চেনো। তো আগে কেন বললে তুমি এমন কোনও গাছই চেনো না?

আলী ধরা পড়ে গেলো। সব স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

জীবন জাগার গল্প : ২৯১

উড়ন্ত ঘোড়া

রাজা দুই ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দিলেন। ফাঁসির সময় নির্ধারণ করা হলো দুই মাস পর।

দুই দণ্ডিতের একজন নিজেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিলো। হতাশা আর নৈরাশ্যের সাগরে ডুবে গেলো। কারাগারের এক কোণে, সারাক্ষণ হাঁটুতে মাথাগুঁজে বসে থাকলো। বসে বসে ফাঁসির অপেক্ষা করতে লাগলো।

আরেক দণ্ডিত আসামি ছিলো খুবই মেধাবী আর বুদ্ধিমান। সে জেলে বসে বসে ভাবতে লাগলো, কিভাবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মুক্তি না হোক, অন্তত আরো কয়টা দিন বেশি বাঁচা যায়।

সে একরাতে বসে বসে ভাবছিলো। বিভিন্ন বিষয়ে ভাবতে ভাবতে রাজাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। রাজার মেজাজ-মর্জি কেমন, রাজা কী পছন্দ করেন, রাজা কোন খাবার বেশি খান ইত্যাদি।

আচানক তার মাথায় এলো, আরে! রাজা তো একটা ঘোড়াকে খুবই পছন্দ করেন। যেখানেই যান, ঘোড়াটার পিঠে চড়েই যান। সকাল-বিকেল ঘোড়ার যত্নআত্তি নেন।

তার উর্বর মাথায় একটা পরিকল্পনা উঁকি দিলো। সে তখনই চিৎকার করে কারা-প্রহরীকে ডাকলো।

-আমি একটু রাজামশায়ের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাজা জানতে চাইলেন:

-বলো দেখি, কী তোমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

-মহারাজ! আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা ঘোড়াকে উড়তে শেখাতে পারি।

-আচ্ছা, তাই নাকি? কিভাবে?

-মহারাজ! এজন্য আমার এক বছর সময় লাগবে। এরমধ্যে ঘোড়াটা উড়তে শিখে যাবে। তাই আমার দণ্ডটা এক বছরের জন্য পেছাতে হবে।

রাজা সম্মত হলেন। রাজা কল্পনায় নিজেকে বিশ্বের একমাত্র উড়ন্ত ঘোড়ার উপর কল্পনা করে, সুখে পা দোলাতে লাগলেন।

আরেক কয়েদী বিষয়টা জানতে পারলো। ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চাইলো:

-তুমি তো ভালো করেই জানো ঘোড়া কখনো উড়তে পারবে না। তবুও তুমি রাজার কাছে এই দুঃসাহসিক প্রস্তাব কিভাবে পেশ করলে?

-ব্যাপারটা যে স্রেফ পাগলামি সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু আমি মুক্তির জন্য নিজেকে সম্ভাব্য চারটা সুযোগ দিয়েছি।

এক: এই এক বছরের মধ্যে রাজা নিজেই মারা যাবেন।

দুই: হয়তো আমি নিজেই মারা যাবো। তাহলে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, ফাঁসির কাষ্ঠে লাঞ্ছনার মৃত্যু হয় নি। সম্মানজনক স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে আমার।

তিন: ঘোড়াটাই হয়তো মারা যাবে।

চার: সত্যি সত্যিই ঘোড়াটা উড়তে শিখবে।

জীবন জাগার গল্প : ২৯২

দামী পাথর

খাদীজাতুল কুবরা মহিলা মাদরাসা। আজ সাপ্তাহিক বয়ানের দিন। মেয়েরা সবাই দক্ষিণের বড় কামরায় জড়ো হয়েছে। মেয়েরা কিরাত পড়ছে। হামদ-নাত পড়ছে। বড় আপু আসবেন আরো পরে। অন্য আপুরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু কথা বলেছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ আর উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছেন। বিশেষ করে নতুন আপুর কথা শুনে সবাই চোখ মুছেছে।

বড় আপু আসলেন। সবাই নড়েচড়ে বসলো। আপু আসার সময় হাতে করে কী যেন নিয়ে এসেছেন। ডানহাতটা মুঠো পাকানো। আঁটো করে রাখা। সবার কৌতূহলী চোখ বারবার ওদিকে চলে যাচ্ছিলো।

আপু হামদ-সানা পড়ে একটা আয়াত তিলাওয়াত করলেন। সূরা আহযাবের তেত্রিশ নাম্বার আয়াতটা তিলাওয়াত করলেন। আপুর প্রিয় আয়াত। সুযোগ পেলেই তিনি এই আয়াত পড়েন। আমরা কেউ ছুটির জন্য গেলেই বলেন:

-নাদিয়া! সেই আয়াতটা পড়ো তো মা!

আপু মুঠোকরা হাতটা উঁচিয়ে ধরে বললেন:

-বলো তো খুকিরা! আমার এই মুঠোকরা হাতে কী আছে? ডানপাশ থেকে একজন একজন করে বলো।

-তুমি কি মনে করো রাবিয়া?

-একটা চকলেট।

-তুমি কী মনে করো নাভিরা?

-এক হাজার টাকার নোট।

-তুমি কী মনে করো আরিয়া?

-হিরে বসানো একটা হার।

-তুমি কী মনে করো রিফদা?

-মূল্যবান কোনও পাথর।

আপু এবার মুঠো খুললেন। দেখা গেলো সুন্দর চকচকে একটা নীলাভ পাথর।

আপু এবার বললেন:

-দেখো বোনেরা! তোমাদের অবস্থাও এমনি। যখন তুমি বোরকায় নিজেকে পুরোপুরি ঢেকে রাখবে, সবাই বলাবলি করতে থাকবে, অনুমান করতে থাকবে মেয়েটা কেমন। একজন একেক রকম ধারণা করবে। অনুমান করবে। সবার ধারণা-অনুমান ঠিক হবে না। তবে যে যাই অনুমান করুক। তুমি ঠিক তাই যা তুমি নিজেকে মনে করো। আর তুমি হলে আল্লাহর অত্যন্ত সুন্দর একটা মাখলুক। আল্লাহর দামী একটা সৃষ্টি। তোমার মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক অনেক বেশি। এজন্য তোমার নিজেকে রক্ষা করে চলা, নিজের সবকিছুকে হিফাযত করা তোমার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৩

মন্ত্রীর বৈশিষ্ট্য

একলোক বেলুনে চড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিলো। পাহাড়ি এলাকা। পথঘাট ঠিক নেই। লোকটা পথ হারিয়ে ফেললো। কম্পাসের রিডিংও ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। বেলুনে উঠার আগে ধারণা করেছিলো, উপর থেকে সব তো দেখা যায়। জায়গা চিনে নিতে কষ্ট হবে না। এখন দেখছে না তার ধারণা ঠিক ছিলো না।

বেলুনটা একটু নামিয়ে আনলো। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নিয়ে এলো। একজন লোক তার জমিতে কাজ করছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো:

-ভাই, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন কোথায় আছি? আমাকে একজনের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। কিন্তু পথ হারিয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেলো।

জমিতে কাজ করা লোকটা বললো:

-আপনি এখন আছেন মাটি থেকে দশ মিটার উপরে একটা বেলুনে। আর ভৌগলিক ঠিকানা বললে, আপনি এখন আছেন রাজধানী থেকে ৪০/৪১ ডিগ্রি দক্ষিণে। ৫৯/৬০ ডিগ্রি পশ্চিমে।

-আপনি এসব কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম ঠিকানা। আপনি কী সব হিসাব-নিকাশের খাতা খুলে বসলেন।

-আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনি বেলুনের ভেতরে রক্ষিত কম্পাসে একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

বেলুনারোহী কম্পাস দেখে বললো:

-হ্যাঁ, কম্পাসে আপনার বলা সংখ্যাগুলো উঠে আছে। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার তো কোনও হেরফের হয় নি। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। ঠিকানা তো পেলাম না। তবে অবাক লাগছে যে, আমার কম্পাসে কী লেখা আছে সেটা তো আপনার জানার কথা নয়। কি করে জানলেন?

-আমি একজন ভূগোলবিদ।

-এখন দয়া করে, নিজের মেধা-বুদ্ধির প্রকাশ না করে সহজ ভাষায় ঠিকানাটা বলে দিন তো!

-আপনি বোধহয় একজন মন্ত্রী?

-অবাক কাণ্ড তো! আপনি কী করে জানলেন?

-কয়েকটা বিষয় দেখে। যে বিষয়গুলো প্রায় সব মন্ত্রীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

এক: আপনি জানেন না, আপনি এখন কোথায় আছেন। কোথায় যাচ্ছেন। আপনার জানা নেই, আপনার এখন ঠিক কী করা উচিত বা কী বলা উচিত। আপনি সামান্য একটু পায়ে হাঁটা পথও বেলুনের সাহায্যে পৌছতে চাচ্ছেন।

দুই: আপনি আপনার যার সাথে দেখা করার কথা, তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি এখনো জানেন না, কিভাবে তার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন।

তিন: আপনি বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছেন, যারাই আপনার নিচে থাকবে, তারা সবাই আপনার আনুগত্য করবে। আপনার সমস্যা সমাধানে একপায়ে খাড়া থাকবে।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৪

সন্তানের সাদকা

এক আলিম বলেন:

-আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম, একদল মৃত লোক দলবেঁধে হেঁটে যাচ্ছে। তাদেরকে খুবই হাসিখুশি দেখাচ্ছিলো। এই লোকদের পিছু পিছু আরেকজন বৃদ্ধলোক আসছিলো। লোকটা বিষণ্ন চিন্তিত।

আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম:

-আপনি এমন মন খারাপ করে আছেন কেন?

-এই যে আমার সামনে হাশিখুশি লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, তারা সবাই দুনিয়াতে নেক সন্তান রেখে এসেছে। সে সন্তানেরা প্রতিদিন তাদের পিতার নামে কিছু না কিছু পাঠায়। তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এখানে পিতাদের আরাম-আয়েশের আয়োজন বাড়িয়ে দেন।

-আপনার কোনও সন্তান নেই?

-আছে, সে নদীর তীরে ধোপার কাজ করে। আমার ছেলে থাকলেও সেটা না থাকার মতোই। আমার কথা সে ভুলেই গেছে।

পরদিন আলিম ঘুম থেকে উঠে নদীর পাড়ে গেলেন। দেখলেন একজন লোক কাপড় ধুচ্ছে আর গজগজ করে বলছে:

-কষ্ট আর কষ্ট।

আলিম জানতে চাইলেন:

-কিসের কষ্ট?

-খাওয়া-পরার কষ্ট। ঘরের কষ্ট। সব ধরনের কষ্টই আমাকে ঘিরে আছে।

-তোমার মৃত পিতার জন্য কিছু দান-খয়রাত করো।

-নিজে খেতে পাচ্ছি না, আবার মরা মানুষের জন্য দান করবো।

-সামান্য কিছু হলেও দান করো।

তখন বৃদ্ধের ছেলে রাগ করে, একমগ পানি তীরের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

-আমি এই পানিটুকু দান করলাম।

রাতে আলিম স্বপ্নে দেখলেন, বৃদ্ধ লোকটা আজ খুবই আনন্দে আছেন। জানতে চাইলেন:

-আপনাকে আজ হাশিখুশি দেখাচ্ছে। তার কারণটা কি?

-আমার ছেলে আমার জন্য এক মগ পানি দান করেছে। সে পানি নদীর তীরে পড়ে থাকা একটা মুমূর্ষ ঘাসফড়িং পান করেছে। আল্লাহ তা'আলা এতে বেশ খুশি হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমার পাশাপাশি ছেলেরও রুজি-রোজগারে বরকত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আলিম বলেন:

-আমি দেখলাম, কিছুদিনের মধ্যে সেই ছেলের রুজি-রোজগার অনেক বেড়ে গেছে।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৫

পোল্ট্রি ফার্ম

এক বেকার যুবক অনেক দিন চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করলো। কোন চাকরি জুটলো না। শেষে এ-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে, পুঁজি যোগাড় করে, একটা পোল্ট্রি ফার্ম দিলো।

বছর খানেকের মধ্যেই, ফার্মের মুরগির বাচ্চা আর ডিমের খ্যাতি পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়লো।

একদিন এক লোক এসে জানতে চাইলো:

– আপনি মুরগিগুলোকে কী খেতে দেন, এত চমৎকার সব বাচ্চা আর ডিম হয়?

– আঙ্গুর, বেদানা, বাদাম আর খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে বিশেষ একটা খাবার তৈরি করি। সেটাই মুরগিগুলোকে খেতে দিই।

– বাহ, আপনার দারূণ বুদ্ধি তো! আমি আয়কর অফিস থেকে এসেছি। জানতে চাচ্ছি খাবার তৈরির এত দামি দামি উপকরণ কেনার টাকা কোত্থেকে পান?

ফার্মের মালিক সতর্ক হয়ে গেলো। কিছু দিন পর এলো আরেক লোক।

– মুরগিগুলোকে কী খেতে দেন? এত ভালো ডিম আর বাচ্চা দেয়?

ফার্মের মালিক আগের চেয়ে সতর্ক। কিছুই খেতে দিই না। ক্ষুধার্ত রাখি।

– আমি এসেছি 'পশুপাখি নির্যাতন প্রতিরোধ সমিতি' থেকে। মুরগির ওপর নির্যাতন করার জন্য আপনাকে জরিমানা করা হলো।

পরের সপ্তাহে আরেক জন এলো। একই প্রশ্ন করলো।

– আপনি কী এমন খাবার দেন যে, মুরগিগুলো বাজারের সেরা মুরগি হয়ে থাকে?

ফার্মের মালিক এবার খুবই সতর্ক।

– আমি প্রত্যেক মুরগিকে প্রতিদিন এক টাকা করে দিই। তারা নিজেদের পছন্দমতো খাবার কিনে খায়।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৬

হালাল-হারাম

ছেলে নতুন চাকরি পেয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলো। মা ছেলেকে অনেক নসীহত-উপদেশ দিয়ে, এই বলে কথা শেষ কথা বললেন:

-দেখতো খোকা! 'হালাল' শব্দটা দুই ঠোঁট খোলা রেখে উচ্চারণ করতে পারিস কিনা?

ছেলে হালাল শব্দটা বারকয়েক আওড়ে দেখলো। তারপর বললো:

-জ্বি আম্মু, পেরেছি।

-এবার দেখতো খোকা! 'হারাম' শব্দটা দুই ঠোঁট না লাগিয়ে উচ্চারণ করতে পারিস কিনা?

ছেলে অনেকবার চেষ্টা করেও দুই ঠোঁট না লাগিয়ে হারাম শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলো না।

-নাহ, আম্মু! পারছি না।

এবার মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন:

-দেখ খোকা! এটাই হলো হালাল আর হারামের মৌলিক পার্থক্য।

-কিভাবে আম্মু?

-হালাল শব্দটা উচ্চারণ করতে যেমন ঠোঁট খোলা থাকে, তেমনি হালাল উপার্জনেও রিযিক ও সৌভাগ্যের দরজা খোলা থাকে। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত দরজা খুলে যায়।

আর হারাম শব্দ উচ্চারণ করতে যেমন ঠোঁট বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি হারাম উপার্জনেও রিযিক ও সৌভাগ্যের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এখন তুই নিজেই বেছে নে দরজা খুলবি নাকি বন্ধ করবি।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৭

উচিত জবাব

দুই গরীব বন্ধু রাজধানীর অভিজাত এলাকার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। প্রথম বন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো:

-হায়! এসব লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই অগাধ ধন-সম্পদ দেয়ার সময় আমরা কোথায় ছিলাম?

দ্বিতীয় বন্ধু এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে, তার হাত ধরে একটা হাসপাতালে নিয়ে হাজির করে বললো:

-হায়! এই পঙ্গু-পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ রোগ-বালাই দেয়ার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

জীবন জাগার গল্প : ২৯৮

স্বীকৃতি

ব্যস্ত রেল স্টেশন। যুবা বয়েসি এক ফেরিওয়ালা ঘুরে ঘুরে টুকিটাকি জিনিসপত্র বিক্রি করছে। কলম, নেলকাটার, সুই ইত্যাদি।

একজন যাত্রী প্লাটফর্মে এলো। হাতে ব্রিফকেস। কাউন্টারে গিয়ে টিকেট কাটলো। ট্রেনে ওঠার আগে তার চোখ পড়লো ফেরিওয়ালার ওপর। এগিয়ে এসে একটা কলম বেছে নিলো। দরদাম করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

লোকটা দৌড়ে ট্রেনে উঠে গেলো। ফেরিওয়ালা হায় হায় করে তার পিছু পিছু ছুটলো:

-ও স্যার! আমার কলমের দাম দিলেন না?

ব্রিফকেসধারী লোকটা প্রথমে খেয়াল করলো না। পরে জানালা দিয়ে দেখলো ফেরিওয়ালা যুবকটা ট্রেনের পাশাপাশি ছুটছে। লোকটা নিজের ভুল বুঝতে পারলো। তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেলো।

-ইশ! আমি একদম ভুলে গেছি তোমার টাকার কথা। ভাগ্যিস তোমাকে দেখেছিলাম। তা কত কলমটার দাম কত যেন বলেছিলে?

-দশ টাকা স্যার।

-এই নাও।

-স্যার, আপনি তো ট্রেন হারালেন।

-ও কিছু নয়। আমি যেমন একজন পেশাজীবি তুমিও একজন পেশাজীবী। আমার যেমন প্রতিদিন অফিসে যাওয়াটা মূলধন তোমারও তেমনি পণ্যের মূল্যটা মূলধন। একজন কর্মজীবী হয়ে আরেকজন কর্মজীবীর ক্ষতি কিভাবে করি?

এই ঘটনার অনেক বছর পর। সেই ব্রিফকেসধারী তার অফিসে, একজনের অপেক্ষায় বসে আছেন। গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে।

আগন্তুক দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো। সামনে বসা লোকটার ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালো। চোখেমুখে নিখাঁদ বিস্ময় ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে চেয়ার টেনে বসেই বললো:

-স্যার! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

-না-তো! আমাদের কি আগে কখনো দেখা হয়েছিলো? কই মনে পড়ছে না-তো!

-আমি কিন্তু স্যারকে দেখেই চিনে ফেলেছি। আজ এতটা বছর স্যার আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি। কিন্তু আপনার কোনও হদিস পাই নি।

-কেন?

-আপনি স্যার একবার রেল স্টেশন থেকে দশ টাকা দামের একটা কলম কিনেছিলেন.......

-ও হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে। তাহলে তুমিই সেদিনের সেই যুবক।

জ্বি স্যার। সেদিন আপনি আমার যে উপকার করেছিলেন, তার উপর ভর করেই আজ এতদূর আসা।

-আমি আবার তোমার কী উপকার করলাম?

-আপনি আমাকে সেদিন পেশাজীবী আর কর্মজীবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর আগে আমাকে কেউ এভাবে সম্মান দেখায় নি।

জীবন জাগার গল্প : ২৯৯

বাগদত্তার তৃতীয় মাত্রা!

গরীব কৃষক। ভাগ্যের ফেরে এবারও ফসল খারাপ হয়েছে। বাধ্য হলো গ্রামের শাইলক বুড়ো থেকে ধার করতে। আগের বছরের কিছু বকেয়াও রয়ে গেছে। কিন্তু এবার বুড়ো নিজ থেকেই ডেকে নিয়ে মোটা অংকের ঋণ হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। না নিয়ে পারা যায় নি।

•

ক'দিন পর বুড়োর আসল রূপ প্রকাশ পেল। ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিল। কৃষকের মাথায় হাত!

-আমি এখন টাকা পাবো কই!

-তাহলে আমার কাছে একটা সমাধান আছে।

-কী?

-তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিতে হবে।

•

কৃষক প্রস্তাবটা শুনে মুষড়ে পড়লো। এমন থুত্থুরে লোলচর্ম কুৎসিত বুড়োর কাছে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে? কৃষকের অসন্তোষ দেখে বুড়ো পাল্টা প্রস্তাব দিল:

-তাহলে, এক কাজ করা যাক, তুমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দাও।

-কিভাবে?

-আমি দুইটা থলের মধ্যে একটাতে কালো নুড়ি, আরেকটাতে শাদা নুড়ি রাখবো। তোমার মেয়েকে বলবো, একটা থলে বেছে নিতে।

ক: কালো নুড়ির থলে নিলে, সে বিয়েতে রাজি বসতে বাধ্য থাকবে। আমিও ঋণ মওকুফ করে দেবো।

খ: শাদা নুড়ির থলে নিলে, বিয়ের প্রস্তাব উঠিয়ে নেব। তবে ঋণ মওকুফ করে দেব।

গ: সে কোনও থলিই যদি ওঠাতে অসম্মত হয়, তার বাবাকে জেলে যেতে হবে।

•

মেয়েকে উপস্থিত করা হলো। বুড়ো তখন উবু হয়ে থলেতে নুড়ি পুরছে। মেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খেয়াল করলো, বুড়ো উভয় থলেতেই কালো নুড়ি পুরছে। প্রস্তুতি শেষ হলো।

•

এ-পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব। ততক্ষণে আমরা একটু গল্পটাকে গুছিয়ে নিই।

•

প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, অসহায় মেয়েটাকে কী পরামর্শ দিতাম? পুরো পরিস্থিতি যাচাই করলে, আমার সামনে তিনটা দিক ফুটে ওঠে:

ক: মেয়েটাকে থলে ওঠানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিতে পারি।

খ: মেয়েটাকে বলতে পারি:

-তুমি বুড়োর চালিয়াতি-জালিয়াতি ফাঁস করে দাও। জারিজুরির গোমর ফাঁক হোক! বুড়োর লালা ঝরা বন্ধ হোক!

গ: মেয়েটাকে বলবো:

-একটা থলে উঠিয়ে বাবাকে ঋণ আর জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করো। নিজেকে বাবার জন্যে উৎসর্গ করো!

•

বাহ্যিক ভাসাভাসা চিন্তায় ভাবতে গেলে, সমাধান আসবে না। তিনটার কোনওটাই শতভাগ নিরাপদ নয়। মেয়েটির বা তার অসহায় বাবার সংকট কাটবে না। তার চেয়ে বরং মেয়েটার হাতেই লাটাই ছেড়ে দিই। সে কোনটা বেছে নেয় দেখি।

•

মেয়েটা দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে গেলো। উপুড় হয়ে একটা থলে তুলে নিয়ে, ঝটপট খুলে নুড়িটা মুঠোয় ভরলো। তারপর আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়ে, নুড়িটা হাত থেকে ছেড়ে দিল। রাস্তার নুড়ির সাথে মিশে গেল হাতের কালো নুড়িটা। পুরো ঘটনা ঘটলো চোখের পলকে। সবাই হায় হায় করে উঠলো। উপস্থিত দর্শকদের কেউ কেউ দৌড়ে এলো সাহায্য করতে।

•

সবাই আফসোস করলেও, বুড়ো ঠিকই মেয়ের চালাকি ধরতে পারলো। তার চর্মসার মুখে ঘৃণা আর তীব্র আক্রোশ ফুটে উঠলো। তার আমও গেলো, ছালাও গেলো।

•

তাহলে:

= বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপাত একটা সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় দেখা না গেলেও, ভিন্ন আঙ্গিকে বিষয়টা নিয়ে ভাবলে, একটা সমাধান বেরিয়ে আসেই। আমরা বাড়তি চিন্তা করতে চাইনা, বাড়তি ঝামেলা পোহাতে চাইনা, বাড়তি পরিশ্রম করতে চাইনা বলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি! হা-হুতাশ করি। হাল ছেড়ে দেই।

জীবন জাগার গল্প : ৩০০

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

ভারতের এক শহরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। মোঘল আমলে নির্মিত এক মসজিদ আছে এখানে। প্রাচীন মসজিদ হওয়াতে দূর-দূরান্তের মানুষও আসে এই মসজিদ দেখতে। মসজিদের বিপরীত পাশেই একটা নতুন মার্কেট উঠেছে। মার্কেটের নীচতলায়, মসজিদ বরাবর দোকানটা বরাদ্দ নিলো একজন মদ বিক্রেতা।

মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিলো। মসজিদ কমিটি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল, তারা কিছুতেই এ দোকান করতে দেবে না। দরকার হলে কোর্টে মামলা করবে। যে লোক দোকানটার বরাদ্দ নিয়েছে, তাকে সরাসরি অনুরোধ করা হলো। লোকটা প্রস্তাবটা শুনেই নাকচ করে দিলো। এক কথায় বলে দিলো:

-মদের বার আমি খুলবই। আমি তো তোমাদের মসজিদে মদ বিক্রি করছি না। আর আমি সরকার থেকে লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসায় নামছি। তোমরা বাধা দেয়ার কে?

মসজিদ কমিটির লোকজন আরো নানাভাবে চেষ্টা করলো। কাজ হলো না। মসজিদে নিয়মিত দু'আ হতে লাগলো।

দোকানে মাল তোলা হয়ে গেলো। আর একদিন পরেই উদ্বোধন হবে। আগের রাতে শহরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ভয়ংকর আওয়াজে বজ্রপাত হতে লাগলো। সকালে দেখা গেলো রাতে বজ্রপাতে পুরো দোকানের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে আছে।

দোকানি খবর পেয়ে ছুটে এলো। আর কিছু করতে না পেরে, দোকানদার কোর্টে গিয়ে মসজিদ কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করলো।

বিচারের দিন মসজিদ কমিটির লোকজন বললো:

-আমরা এই ধ্বংসের জন্য দায়ী নই। আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা কিছুই করি নি।

আর দোকানদার বললো:

-মসজিদ কমিটি মিথ্যে বলছে। তারা তাদের ভগবানের কাছে নিয়মিত আমার দোকানের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছে। তাদের অভিশাপের কারণেই আমার দোকান পুড়ে গেছে।

উভয়পক্ষের কথা শুনে বিচারক বললেন:

-বিচারের রায় যাই হোক, আমার কাছে একটা বিষয় অবাক লেগেছে, মদের দোকানদার একজন হিন্দু হয়েও মুসলমানদের দোয়া-দরূদের শক্তিতে বিশ্বাস করে।

আর মুসলানরা তাদের আল্লাহর কাছে মদের দোকানের বিরুদ্ধে দু'আ করেছে। কিন্তু নিজেরাই সেই দু'আ-দুরূদের শক্তিতে বিশ্বাস করে না।

জীবন জাগার গল্প : ৩০১

ফাদারের ওয়াজ

একটা চার্চে ফাদার সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা অনুষ্ঠানে কথা বলছেন। একজন প্রশ্ন করলো:

-ফাদার! ঈশ্বর আমাদেরকে যে ভালোবাসেন তার প্রমাণ কী?

ফাদার বললেন:

-তাহলে একটা গল্প বলি। শোন, স্বপ্নে এক লোকের সাথে ঈশ্বরের দেখা হলো। ঈশ্বর লোকটার হাত ধরে সমুদ্রতীরে নিয়ে গেলো।

লোকটা দেখলো, সমুদ্রের বালুকাবেলায় দু'জন মানুষের পায়ের ছাপ অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু কিছুদূর পরপরই একজনের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। একজনের পায়ের ছাপের পাশাপাশি অপরিচিত এক প্রাণীর পায়ের ছাপও বালুতে অঙ্কিত হয়ে আছে। খেয়াল করলেই বোঝা যাচ্ছে প্রাণীটার সাথে অনেক লড়াই করতে হয়েছে সেই একজনকে। লোকটা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলো:

-কিছুদূর পরপরই একজনের পায়ের ছাপ কেন? আর এই অপরিচিত পায়ের ছাপটাই বা কিসের?

-আমরা দু'জন যখন বালুকাবেলায় হাঁটছিলাম, তখন একটা হিংস্র জন্তু তোমাকে বারবার আক্রমণ করছিলো।

-ও আচ্ছা! সেজন্যই একজনের পায়ের ছাপ, হিংস্র জন্তুটা আক্রমণ করার সময় আপনি বুঝি আমাকে একা রেখেই উড়ে চলে গিয়েছিলেন? না হলে পায়ের ছাপ আপনারটা কোথায়?

-বৎস! তুমি বুঝতে ভুল করেছো। আমি বান্দাকে অসহায় রেখে কোথাও চলে যাই না। যেতে পারি না।

-তাহলে পায়ের ছাপ একজনের কেন? আপনারটা কোথায়?

-বৎস! সেটা আমারই পায়ের ছাপ।

-তাহলে জন্তুটার আক্রমণের সময় আমি কোথায় ছিলাম?

-তুমি ছিলে আমার কোলে।

জীবন জাগার গল্প : ৩০২

খুকি ও কচ্ছপ

নাসামার খুব শখ, সে একটা কচ্ছপ পুষবে। তাদের বাড়ির পুকুরে অনেক কচ্ছপ। বড় মামা জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় একটা কচ্ছপ উঠলো। নাসামা বায়না ধরলো:

-মামা, কচ্ছপটা পানিতে না ফেলে আমার জন্য রেখে দাও না।

-তুই কচ্ছপ দিয়ে কী করবি?

-আমি পুষবো।

-এ্য হে! কচ্ছপ আবার পোষার জিনিস হলো? মানুষ পোষে ময়না, খরগোশ। তুই কিনা......

নাসামা কচ্ছপটা রেখেই দিল। পরিবারের অন্যরাও তার আগ্রহ দেখে কচ্ছপটাকে মেনে নিল। কচ্ছপটা দিন দিন বড় হতে লাগল।

দেখতে দেখতে শীতকাল এসে গেল। কচ্ছপের জন্য খড় দিয়ে একটা বাসা বানানো হলো। যাতে শীতে কষ্ট না পায়। কচ্ছপ তো পানিতেই থাকে, তার ঠাণ্ডা লাগে কী জানি। তবুও আম্মু আগ্রহ করে বাসাটা বানিয়ে দিয়েছেন। সেদিন সারাদিন খুব শীত পড়লো। সন্ধ্যে হতে না হতেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করলো। দাদীজান খড়ের গাদা থেকে খড় এনে উঠোনে আগুন জ্বাললেন। পুরা ছেলেমেয়েরা আগুনের চারপাশে গিয়ে জুটলো। নাসামা গেলো গোয়াল ঘরে কচ্ছপটাকে নিয়ে আসতে। ওটাও আগুন পোহাতে পারবে। ওখান গিয়ে দেখে, ওটা খোলসের মধ্যে মুখ গুঁজে এক কোণে পড়ে আছে।

নাসামা ওটার খোলসের ওপর চাপ দিলো, ধাক্কা দিয়ে দেখলো, কিন্তু ওটা মুখ বের করলো না। নাসামা রেগে গেলো, আশ্চর্য তো! অন্য সময় সামান্য হাত লাগালেই ঘোড়ার মতো ছুট দেয়। আজ সামান্য ঠাণ্ডা পড়তেই এমন কুঁকড়ে গেলো? একটা লাঠি এনে খোলসের ওপর আঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো:

-হাঁট, মুখ বের কর বলছি!

নাসামার কাণ্ড দেখে আব্বু এগিয়ে এসে বললেন:

-কেন মা শুধু শুধু অবলা প্রাণীটাকে মারছো? এদিকে দেখে যাও। তোমার সমস্যা সমাধান কি করে সহজেই হয় দেখো।

আব্বু কচ্ছপটার একটু দূরে জ্বলন্ত কয়লার হাঁড়িটা এনে রাখলেন। হাঁড়িতে কয়েকটা কাঠের ছোট টুকরা ছেড়ে দিলেন। আস্তে আস্তে আশপাশ গরম হতে শুরু করলো। কচ্ছপটা গরমের আঁচ পেয়ে নড়েচড়ে উঠলো। নাসামা খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠলো।

আব্বু মুচকি হেসে, নাসামাকে বললেন:

-দেখ মা! এই তুমি পিটিয়েও কচ্ছপটার মুখ বের করতে পারো নি। অথচা সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া পেয়েই কচ্ছপটা মুখ বের করে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে।

তুমি তোমার জীবনেও এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে। তুমি অন্যকে জোর করে তোমার মতে আনতে চাইলে, পারবে না। সেখানেও তোমাকে প্রথমে আন্তরিকতার উষ্ণতা সৃষ্টি করতে হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩০৩

পিতা পুত্রকে

বাবা দেখলেন ছেলে সারাদিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। রাত হলেও না ঘুমিয়ে ফেসবুকে মগ্ন থাকে। পরদিন নাস্তার টেবিলে, ছেলেকে বললেন:

-বাবা! তোমাকে দেখি সারাক্ষণ ফেসবুক নিয়ে পড়ে থাকতে। তোমাকে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। না হলে তুমি ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

= ফেসবুক হলো একটা গভীর সমুদ্র। এ সাগরে ডুবে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে।

= ফেসবুক ব্যবহারে তুমি মৌমাছির মতো হবে। মৌমাছি যেমন শুধু মধুওয়ালা ফুলের ওপর বসে, সেখান থেকে মধু আহরণ করে অন্যদের উপকার করে। নোংরা-ময়লা স্থানে বসে না।

তুমিও মৌমাছির মতো ভালো ভালো পেজগুলোতে যাবে। প্রথমে নিজে উপকৃত হবে, তারপর অন্যদেরও উপকার করবে।

= বাবা! তুমি মাছির মতো হয়ো না। মাছি ভালো-মন্দ সবকিছুর ওপর বসে। অজান্তেই খারাপ জায়গা থেকে রোগবালাই ছড়ায়।

তুমিও যে সে পেজে যেওনা। এতে তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তোমার বন্ধুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

= বাবা! তুমি কোনও লেখায় মন্তব্য করার আগে, কোনও লেখা শেয়ার করার আগে চিন্তা করবে, তুমি যা করছো, সেটাতে আল্লাহ তা'আলা রাজি হবেন নাকি নারাজ হবেন।

একটা কথা মনে রাখবে, মুমিনের প্রতিটি কাজই আল্লাহকে রাজি–খুশি করার জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ বান্দাকে সৃষ্টিই করেছেন তার ইবাদতের জন্য।

= অনেকে তোমাকে বলবে, ফেসবুক হলো আনন্দ-বিনোদনের জায়গা। এখানেও ধর্মের কচকচি ভালো লাগে না। তুমি তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ো না। একজন মুমিনের সামান্য থেকে সামান্য কাজও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া হতে পারে না। নিছক বিনোদন করার জন্য কিন্তু তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নি।

= অনেকে বলবে, ফেসবুকে আসি কিছুটা সময় মজা করে কাটানোর জন্য। তুমি তাদের কথায় কান দিও না।

=বাবা! তুমি ফেসবুকে কারো বিরুদ্ধে কিছু লেখার আগে নিশ্চিত হয়ে নিবে, তুমি যা জেনেছো বা তুমি যা ভাবছো সেটার উৎস সঠিক কি না।

তুমি কারো বিরোধিতা করলে, ভদ্র ভাষায় করবে। তবে এটা নিশ্চিত হয়ে নিবে, তুমি যার বিরোধিতা করছো, সে তোমার বিরোধিতা ভালোভাবে নিবে কিনা।

=বাবা! ফেসবুকে এমন মানুষও পাবে, যারা তোমার ভদ্রভাষার বিপরীতে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবে। বিষয়ের আলোচনা বাদ দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিবে। এমন লোকের সমালোচনা করা তো দূরের কথা, প্রশংসাও করার দরকার নেই। এমন লোককে ফ্রেন্ডলিস্টেও রাখার দরকার নেই।

-তুমি আরেক জনের সাথে ইনবক্সে যা আলোচনা করছো, সেটা স্ট্যাটাসে প্রকাশ করবে না।

=কাউকে কোনও দোষ ধরিয়ে দিতে চাইলে ইনবক্সে করবে। সবার সামনে করবে না।

=বাছা! ফেসবুকে এসে তোমার চরিত্রকে খুইয়ে বসো না। যদিও তুমি ছদ্মনামে ফেসবুক ব্যবহার করে থাকো। আল্লাহ তো গোপন ও প্রকাশ্য সব খবরই জানেন।

=বাবা! কেউ তোমাকে আঘাত করলে তুমিও তাকে পাল্টা আঘাত করো না। কেউ তোমাকে গালি দিয়ে মন্তব্য করলেও তুমি পাল্টা জবাব দিও না। সে গালি দিয়ে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেছে, তুমিও নীরব থেকে তোমার স্বরূপ প্রকাশ করো।

=তুমি যা লিখছো, যে স্ট্যাটাস দিচ্ছো, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তুমিও যেমন তোমার মনের কথা লিখছো, ফিরিশতারাও তোমার কর্মের কথা লিখে রাখছেন। আল্লাহ তা'আলা সবার ওপর থেকে হিসাব রাখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন।

তুমি এটা ভুলে যেও না, তুমি একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, সেদিন পাপীদের জন্য অনুতাপ আর অনুশোচনা ছাড়া কিছুই থাকবে না।

=বাবা! তোমার ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি আশংকা যেটা হয় সেটা হলো:

হারাম কিছু দেখা। হারাম কিছু পড়া। হারাম ও বিকৃত ছবি দেখা। একমাত্র কলবে সলীম বা সুস্থ-সুন্দর হৃদয় যার আছে সেই একমাত্র এ ভয়াবহ পাপ থেকে বাঁচতে পারে। তুমি এমন পাপের সম্মুখীন হলে ইস্তিগফার-আউযুবিল্লাহ পড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়বে। ঠিক বাঘ দেখলে যেভাবে পালাও সেভাবে পালাবে। অন্যথায় জাহান্নাম হবে তোমার ঠিকানা।

=বাবা! তুমি ফেসবুককে দ্বীনের প্রচারের জন্যেই ব্যবহার করবে। অন্যকিছুর জন্য নয়।

=তোমার মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে, একবার বা দুইবার পাপ করলে কিছু হবে না। পরে তাওবা করে নিলেই হবে।

আচ্ছা! তাহলে তুমি মুমিন হওয়ারই বা কী দরকার? কাফির হয়ে ইচ্ছা মতো জীবন যাপন করে, শেষ জীবনে ঈমান আনো, তাহলে তো আরো ভালো হয়?

=বাবা! তোমাকে নিয়ে আরেকটা ভয়াবহ আশংকা যেটা হয় তা হলো:

তুমি ফেসবুকে খারাপ বন্ধুর পাল্লায় পড়তে পারো। পাপ-পংকিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিকৃতমানস কোনও পুরুষের পাল্লায় পড়তে পারো।

বাবারে! খুবই সতর্ক থেকো।

তুমি তাদের মিষ্টি কথায় ভুলো না। তাদের মধুমাখা লেখায় নিশ্চিন্ত হয়ো না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

তোমরা তোমাদের ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। (পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না।)।

প্রতিটি কাজই তার সঠিক পন্থায় করা উচিত।

=বাছা আমার! একজন মানুষের কাছে তার চারিত্রিক পবিত্রতা থেকে মূল্যবান আর কিছুই নেই। তুমি খেয়াল করলে দেখবে, দুষ্ট লোকেরা প্রথম প্রথম মেয়েদের পেছনে পেছনে ছুটে। তাদের বন্ধুত্ব পাওয়ার আশায় কাকুতি মিনতি করে। পরে যখন তাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়ে যায়, তখন মেয়েদেরই উল্টো তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে হয়। আর সেই পাপিষ্ঠ পালিয়ে বাঁচে।

=বাবা! তুমি একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না, আমরা কেন সৃষ্ট হয়েছি। এটা মনে রাখবে, এই জীবনের পর আর সুযোগ নেই। হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সব ধরণের পাপ থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

জীবন জাগার গল্প : ৩০৪

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

প্রথম জীবনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে উঠে এসেছেন। লেখালেখিটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন সবার বাধা ডিঙিয়ে। পরিবার বন্ধু-বান্ধব, ভাই- বেরাদর সবাই পরামর্শ দিয়েছিলো ব্যাংকের চাকুরিটা ধরে রাখতে। চাকুরির পাশাপাশি লেখালেখির কাজ চালিয়ে যেতে। কিন্তু মন বলছিলো চাকুরি ও লেখালেখি একসাথে চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এহেন মানসিক টালমাটাল অবস্থায় তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো স্ত্রী মাহমুদা। সে সময় মাহমুদা তার শক্ত অবস্থান নিয়ে না দাঁড়ালে, তিনি কিছুতেই এত কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। জীবনের ধাপে ধাপে সামনে আসা বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নও পার হওয়া সম্ভব হতো না।

কিন্তু এবারের মানসিক অবসাদ বুঝি আর কাটিয়ে ওঠা গেল না। গত বেশ কিছুদিন ধরে কলম দিয়ে কোনও লেখাই বের হচ্ছে না। কলম-কাগজ নিয়ে বসেন। কাগজে কিছুক্ষণ আঁকিবুকি করে উঠে পড়েন। হিজিবিজি লেখা কাগজটার স্থান হয় ময়লার ঝুড়ি।

অন্যদিনের আজও এক প্রকার জোর করেই লিখতে বসলেন। কলম হাতে নেয়ার পর অজান্তেই মনের ব্যথাগুলো বের হয়ে এল:

-গত বছর পিত্তথলিতে অস্ত্রোপচার হলো। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকতে হলো। এখন আমার বয়েস ষাট, প্রকাশনা সংস্থার বাধা লেখালেখির কাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ত্রিশ বছর সেখানে একটানা কাজ করেছি। এই বছরের শুরুতে বাবা মারা গেলেন। মা তো আগেই চলে গেলেন। এর মধ্যে একমাত্র ছেলেটা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে, পরীক্ষায় ফেল করলো। কী দুর্ভাগময় একটা বছরই না কাটাচ্ছি!

লেখক এসব লিখে টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী চুপিচুপি এসে পৃষ্ঠার লেখাটা পড়লেন। তারপর যেভাবে এসেছিলেন, নীরবে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে, আগের কাগজটার পাশেই আরেকটা কাগজ রেখে দিলেন।

লেখক একটু পর মাথা তুলে দেখলেন, তার সামনে আরেকটা কাগজ পড়ে আছে। তাতে লেখা আছে:

দেখো:

* গত বছর তুমি দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা পিত্তথলির সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছো।

* তুমি ষাট বছর পা দিয়েছো পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায়।

* প্রকাশনা সংস্থার চাকুরিটা ছেড়ে দেয়ার পর, তুমি এখন ঝাড়া হাত-পা। গুরুত্বহীন আজেবাজে ফরমায়েশী বই আর লিখতে হবে না। তুমি এখন নিজের মতো করে, পরিণত বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে লিখতে পারবে।

* তোমার পিতা পঁচাশি বছর বড় কোনও রোগবালাই ছাড়া সুস্থ জীবন কাটিয়েছেন। নিজে শেষ জীবনের কোনও যাতনা ভোগ না করেই ঈমান-আমানে ইন্তেকাল করেছেন।

* তোমার ছেলে ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েও, বড় ধরনের কোনও ক্ষতি ছাড়াই বেঁচে আছে।

= আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কত নিয়ামতপুর্ণ একটা বছর দান করেছেন। কী সুন্দরভাবেই না আমাদের বছরটা কেটেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৩০৫

মুয়াজ্জিন

জুম'আর আযান হয়ে গেছে। দু-একজন করে মুসল্লি মসজিদের দিকে আসা শুরু হয়েছে।

খতীব সাহেবের বয়ান শুরু হয়েছে। মুসল্লিতে ভর্তি হয়ে গেছে মসজিদ। একটু পর খুতবা শুরু হবে।

খতীব সাহেব মিম্বরে উঠে বসলেন।

এমন সময় মাইকে সমস্যা দেখা দিলো।

-এই মুয়াজ্জিন সাহেব! সারাদিন কী করেন? সামান্য মাইক ঠিক করে রাখতে পারেন না?

পুরো মসজিদ হৈ রৈ করে উঠলো।

-এই অযোগ্য লোকগুলোকে কেন যে মসজিদে চাকরি দেয়া হয় আল্লাহ জানেন।

-মসজিদে বসে বসে খায় আর মাস শেষে বেতন গুণে।

-এদের মসজিদ ঝাড়ু দেয়া ছাড়া তো কোন কাজ নেই, তারপরও কেন ঠিকমতো কাজ করে না?

বেচারা মুয়াজ্জিনের চোখ দিয়ে পানি চলে আসার উপক্রম। সবাই তো মানুষ। মান-অপমান বোধ সবারই আছে।

নামাযের পর মুয়াজ্জিন সাহেব এসে কেঁদে বললেন:

-হুযুর, আর চাকরি করবো না। আমাদেরকে কমিটির লোকেরা মানুষ বলে মনে করে না। চাকরের সাথেও মানুষ এমন আচরণ করে না।

জীবন জাগার গল্প : ৩০৬

নাজাতের উসীলা

এক:

নাবিল গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। দামি গাড়ি। ভেতরে এসি চলছে। বাইরে প্রচণ্ড গরম। চরাচর তীব্র দাবদাহে গলে যেতে চাইছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়াও খুব একটা নেই। তার চোখ পড়লো একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। পরিধেয়

শতচ্ছিন্ন। লাঠি ভর দিয়ে। দরদর করে ঘামছে। প্রখর রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোনও ছাতা নেই। নাবিল গাড়ি থামিয়ে বললো:

-চাচাজান গাড়িতে উঠুন। চলুন আপনাকে গন্তব্যে নামিয়ে দেবো।

(এটা নাজাতের উসীলা হতেও পারে)

দুই:

করীম সাহেব ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরলেন। তীব্র যানজটে পড়ে, এক ঘণ্টার পথ আসতে আজ লেগেছে চার ঘণ্টা। কোথায় বাসায় পৌছবেন সন্ধ্যে সাতটায় তা না, পৌছলেন রাত নয়টায়।

বিরক্তি, পেটের ক্ষুধা, পানির পিপাসা সব মিলিয়ে মেযাজ তিন চার রকমের হয়ে আছে। বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই বৃদ্ধা মা এসে কাশতে কাশতে বললেন:

-খোকা! আমার জন্য দুধ এনেছিস?

করীম সাহেব সাথে সাথে বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন:

-না মা, একদম ভুলে গেছি। এই এখুনি যাচ্ছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুধ নিয়ে ফিরবো ইনশাআল্লাহ।

(এটা নাজাতের উসীলা হতেও পারে)

তিন:

হোসেন সাহেবের আজ এক সপ্তাহ যাবৎ জ্বর, মাথাব্যথা। মুখে রুচি নেই। প্রায় অভুক্ত অবস্থায় আছেন। শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। নামায মসজিদে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘরেও কোনরকমে বসে বসে পড়তে হচ্ছে।

আজ অনেক কষ্টে ওযু সেরে যোহর নামায পড়তে বসেছেন। সিজদায় গেলেন। এমন সময় ছোট্ট মেয়ে ফাতিমা এসে পিঠে চড়ে বসলো।

হোসেন সাহেব তাসবীহ পড়া শেষ হলেও সিজদায় পড়ে থাকলেন। মেয়েটা যদি পড়ে যায়?

(এটা নাজাতের উসীলা হতেও পারে)

চার:

আবিরদের বাড়ির পাশেই বিরাট এক লোহার কারখানা। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা মেশিন চলছেই। পুরো কারখানাটা সারাক্ষণই আগুনের মতো গরম হয়ে

থাকে। এক ঘণ্টা পরপরই শিফট বদল হয়। ভেতরের শ্রমিকগুলো কাজ শেষে বাইরে এসে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। তৃষ্ণার্ত উটের মতো ঢক ঢক করে পানি পান করে।

আবির প্রায়ই তাদের বাসার ডীপ ফ্রিজ থেকে বড় ক্যানে করে পানি নিয়ে তাদেরকে পান করতে দেয়। গরীব শ্রমিকগুলো তার দিকে কেমন ঘোর লাগা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাকে।

(এটা নাজাতের উসীলা হতেও পারে)

পাঁচ:

আরিয়ার খুবই শখ একটা তোতা পুষবে। আম্মু নিষেধ করেন। বলেন:

-কেন কেন একটা মুক্ত পাখিকে খাঁচাবন্দী করে রাখবে?

-আম্মু আমি তো সেটাকে ভালো করে আদর-যত্ন করার জন্যই পুষবো।

আম্মু বললেন:

-তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, প্রতিদিন কিছু কিছু চাল বাড়ির পেছনের ক্ষেতটাতে ছিটিয়ে দিয়ে এসো।

আরিয়া তাই করতে থাকলো। প্রতিদিন স্কুল থেকে দুপুরে ফিরেই, কয়েকটা নারিকেলের মালায় করে কিছু চালের খুদ, আর পানি নিয়ে ক্ষেতটাতে রেখে আসে। প্রতিদিন অনেক কাক, ময়না, ঘুঘু এসে সেগুলো খেয়ে যায়।

(এটা নাজাতের উসীলা হতেও পারে)

জীবন জাগার গল্প : ৩০৭

হাজমোলা

সালমা বেগম আজ একটু আগে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বাতের ব্যথাটা একটু বেশি উঠেছিলো। কোনও রকমে ইশাটা পড়ে আর দেরি করেননি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন:

-তার ছেলে ইসামের একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স। সে একটা কাঠি ধরিয়ে বাক্সের সমস্ত শলাকায় আগুন ধরিয়ে দিলো। এরপর সেই আগুনকে চোখের কাছে নিয়ে গেলো। আগুনের আঁচে চোখ দু'টো টকটকে লাল রক্তবর্ণ ধারণ করলো।

সালমা বেগম এমন বিকট স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বারবার আউযুবিল্লাহ পড়তে লাগলেন। তার মনে হতে লাগলো তার কলিজার টুকরা ইসামের কোনও ক্ষতি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে ইসামের কামরার দিকে গেলেন।

গিয়ে যা দেখলেন তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ছেলে এই গভীর রাতে, কম্পিউটারে এমন কিছু দেখছে, যা একজন সতের বছরের ছেলের জন্য দেখাটা শোভা পায় না।

তার কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু কম্পিউটারের স্ক্রীনের ছবিগুলো জানলার কাঁচে প্রতিফলিত হচ্ছিল।

সালমা বেগম দোটানায় পড়ে গেলেন। একবার ভাবলেন চীৎকার করে দরজায় ধাক্কা মারবেন। আবার ভাবলেন ইসামের বাবাকে ডেকে আনবেন। পরে কী ভেবে নীরবেই ফিরে গেলেন।

শুয়েও ঘুম আসছিলো না। এপাশ ওপাশ করেই বাকি রাতটুকু পার করলেন। শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, যেন তিনি আগামী কাল সকালে এই সমস্যা সমাধানের একটা উপযুক্ত সুরাহা বের করে দেন।

সকালে ইসামের আব্বু অফিসে চলে গেলেন। ইসাম কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাসা এখন খালি। সালমা বেগম দেখলেন এটাই মোক্ষম সুযোগ। তিনি ইসামের কামরায় গেলেন। লেখাপড়ার খোঁজ-খবর করার এক পর্যায়ে তিনি ইসামকে প্রশ্ন করলেন:

-আচ্ছা বল তো, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য কী করবে?

-সে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে খাবার কিনে খেয়ে নিবে।

-যদি তার কাছে খাবার কেনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা না থাকে?

প্রশ্নটা শুনে ইসাম একটু থমকে গেলো। কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে যেন।

সালমা বেগম আবার প্রশ্ন করলেন:

-ধরো তার কাছে সামান্য যে কয়টা টাকা আছে সেটা দিয়ে খাবার পাওয়া যাবে না, তাই সে কয়েকটা হাজমোলা (হজমবর্ধক বড়ি) কিনল। তখন তুমি তার সম্পর্কে কী ধারণা করবে?

-আমি নিশ্চিতভাবেই বলবো লোকটা আস্ত পাগল। সে হাজমোলা দিয়ে কী করবে? তার কাছে খাবারই তো নেই!

-তুমি কি সত্যিই তাকে পাগল মনে করবে?

-জ্বি, আম্মি! সে তো আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো, যে তার কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছে।

আম্মু এবার হেসে বললেন:

-তুমিও তো এই পাগলের মতোই কাজ করছো!

-আমি? আ-আমি কী করেছি?

-হাঁ, তুমি। তুমি এমন কিছু দেখছো, যা তোমার মধ্যে নারীর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে দিবে।

ইসাম এবার পুরোপুরি খামোশ হয়ে গেলো। লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো।

আম্মু বললেন:

-তুমি তো ঐ ব্যক্তির চেয়েও অনেকগুণ বেশি পাগল। সে লোকটা তার হজমশক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে এমন খাবারের জন্য যেটা তার সাথে নেই। লোকটার কাজ বোকাসুলভ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু লোকটা যে খাবারের হজমশক্তি বৃদ্ধির জন্য হাজমোলা খেয়েছে সেটা তো তার জন্য হারাম নয়।

কিন্তু তোমার বিষয়টা তো তার ব্যতিক্রম। তুমি এমন বস্তুর আগ্রহ বৃদ্ধিকর বস্তু দেখছো, যেটা তোমার জন্য হারাম। তুমি আল্লাহর কালামকে ভুলে গেছো:

(হে নবী! আপনি মুমিনগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে অবনত রাখে। এবং আপন লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত কর। এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। সূরা নূরঃ ৩০)।

-আম্মু! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি জঘন্য গুনাহ করেছি। আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি, এমন গুনাহ আর করবো না। ইনশাআল্লাহ

জীবন জাগার গল্প : ৩০৮

পিতা ও পুত্রী

(ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকা এক পিতা ও কিছুদিন আগে মারা যাওয়া মেয়ের কথোপকথন)

বাবাঃ মা রে! তুই কেমন আছিস?

মেয়েঃ আমি কেমন আছি সেটা দিয়ে তুমি কী করবে? আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

বাবাঃ মা, তুই দেখি রেগে আছিস।

মেয়েঃ রেগে থাকবো না তো কি হেসে বেড়াবো?

বাবাঃ তোর চেহারা-সুরতের এই দশা কেন? আর তুই আমার দিকে এমন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছিস কেন?

মেয়েঃ আমার ভেতরে রাগের পাহাড় জমে আছে। কিছু মানুষকে হাতের কাছে পেলে হাড় চিবিয়ে খেয়ে ফেলতাম। তাহলে এখানে যাক্কুম খাওয়ার জ্বালা কিছুটা হলেও মিটতো।

বাবাঃ তোকে ওখানে যাক্কুম খেতে দিচ্ছে?

মেয়েঃ কেন তুমি কি আমার জন্য এখানে শারাবান তাহুরার ব্যবস্থা করে রেখেছিলে নাকি?

বাবাঃ আমি তো সাধ্যানুযায়ী তোকে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছি।

মেয়েঃ এই বাবা! বাজে কথা বলবে না। তুমি আমার কী লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছ? তোমার কারণেই আজ আমার এই হাল।

বাবাঃ আমি আবার কী করলাম। আমি তো তোর যখন যা লাগে, এনে দিয়েছি। তোর কোনও কাজে বাধা দেই নি। তোর জন্য সব করেছি।

মেয়ে: আরে সেটাই তো আমাকে আজ ডুবিয়েছে। তুমি যেটাকে সব বলছ, সেটাই স-ব নয়। তুমি আমার জন্য অনেক কিছুই করো নি। তুমি আমাকে ফজরের নামাযের সময় ডেকে দাও নি। তুমি আমাকে একা একা মার্কেটে যেতে বাধা দাও নি। তুমি আমাকে টিভি-কম্পিউটারে খারাপ ছবি দেখতে বাধা দাও নি। আমার স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যেতে দেখেও তুমি কিছুই বলো নি। আমি রাত জেগে কম্পিউটার-ইন্টারনেটে কী করতাম তার খোঁজখবর করো নি। আমি সারাক্ষণ রুমে উচ্চগ্রামে মিউজিক বাজাতাম, তুমি একটি বারের জন্যও বাধা দাও নি। পাড়ার দোকান থেকে সিডি-ডিভিডি কিনে আনতে গেলে, তারা অশ্লীল কথা বলতো জেনেও তুমি কিছু বলো নি। আমরা টিভি সিরিয়াল দেখে ঘরেও সেসবের আলোচনা করলে, তুমি বাধা দাও নি।

এরপরও তুমি বলবে, তুমি আমার জন্য সবকিছু করেছো? দাঁড়াও, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে না ফেলতে পারলে আমার স্বস্তি হবে না।

(মেয়ে বাবাকে ধরার জন্য দৌড়ে এল)

বাবা বিকট চীৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে হাঁপাতে লাগলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩০৯

দাদুর কথা

দাদু লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে ঠক ঠক করে পথ চলছে। ছোট্ট নাতিটাও সাথে সাথে পথ চলছে। আর দুষ্টুমি করে দাদুর অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। এটা দাদু দেখে দাদু মুচকি হেসে বললেন:

-আমার বয়েসে পৌঁছলে তুমিও এমন হয়ে যাবে। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটবে। শক্তি ফুরিয়ে যাবে। কুঁজো হয়ে যাবে।

-কেন দাদু, আপনার শক্তিগুলো কোথায় গেলো?

-সারাজীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করতে করতে শরীরের শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছি। এখনো এই বৃদ্ধ বয়েসেও খাটুনি বন্ধ হয় নি।

-কিসের খাটুনি? কই দাদু, আপনাকে তো সব সময় ঘরে বসে বসে তাসবীহ-তাহলীল, নামায-তিলাওয়াত মগ্ন দেখি?

-না দাদাভাই, তুমি খেয়াল করোনি বলে দেখতে পাও না। আমি সব সময়:

* দুইটা বাজপাখির সাথে লড়াই করি। সেগুলোকে পোষ মানানোর জন্য কঠোর সংগ্রাম করি। সেগুলোকে নিয়মিত ট্রেনিং দেই।

* আমার দুটো পোষা খরগোশ আছে, সেগুলোকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। সে দুটোর যেখানে-সেখানে, যখন-তখন চলে যাওয়া রোধ করতে হয়।

* আমার দুইটা চিল আছে, সেগুলোর দেখা শোনা করাও কম খাটুনির কাজ নয়। কখন কার মোরগের ছানা খেয়ে ফেলে, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

* একটা সিংহ আছে, সেটার কথা ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে। উফ! কী ভয়ানক। প্রতিদিন আমার ঘাম ঝরিয়ে ছাড়ে। সেটাকে শক্ত লোহার খাঁচায় বন্দী করে রাখতে হয়।

* তা ছাড়া আমাকে একজন রোগীর দেখাশোনাও নিয়মিত করতে হয়। সেবাশুশ্রূষা করতে হয়।

নাতি ভীষণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো:

-কই দাদু! আপনি এতকিছু কখন করেন? আমি তো আমাদের ঘরে কিছুই দেখিনি।

-দেখো দাদাভাই!

=আমার দু'চোখই হলো আমার দুই বাজপাখি। দুই চোখকে হারাম-দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

=আমার দুইপা হলো 'দুই খরগোশ'। সবসময় পা দু'টোকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। যাতে সে দু'টো পাপকাজের দিয়ে চলে না যায়।

=আমার দুই হাত হলো 'দুইটা চিলের মতো'। হাত দু'টোকে সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যাতে অন্যের হক মেরে না খায়।

=আর সিংহটা হলো আমার অন্তর। এটা হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক। এটাকে বাগে আনতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়। তবুও কি পুরোপুরি বশে আসে? প্রতিনিয়ত আমাকে যুঝতে হয় এই অন্তরের সাথে। এটাকে বন্দী করে রাখা ছাড়া এক দণ্ড স্বস্তিতে থাকা যায় না।

=আর অসুস্থ ব্যক্তির কথা যে বললাম? সেটা হলো আমার পুরো শরীর। এই শরীরকে সব সময় আদরে-যত্নে রাখতে হয়।

জীবন জাগার গল্প : ৩১০

নামাযি

স্কুল থেকে ঘরে ফিরেই আম্মার দেখতে পেলো কেমন যেন উৎসব উৎসব ভাব। আম্মু আর আপু মিলে সবকিছু গোছগাছ করছে। আম্মার আম্মুর কাছে গিয়ে জানতে চাইলো:

-আম্মু! আজ গ্রাম থেকে দাদাভাই বেড়াতে আসবেন বুঝি? এভাবে ঘরদোর তো দাদাভাই এলেই গোছানো হয়।

আম্মু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন:

-সময় হলেই বুঝতে পারবে।

আম্মুর কাছে কোনও সদুত্তর না পেয়ে, আপুর কাছে গেলো।

-আপুনি! বলোতো আজ বাসায় কী হবে? এত সাজানো-গোছানো হচ্ছে কেন?

আপু রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো:

-সময় হলেই সব দেখতে পাবে।

বিকেল হতে না হতেই আম্মার দেখলো, দাদা-দাদু রিকশা থেকে নামছেন। আব্বু দৌড়ে এসে রিকশা থেকে ব্যাগগুলো নামাচ্ছেন।

আরো অবাক করা ব্যাপার হলো, নানা-নানুও এসে পড়েছেন। এখানেই শেষ নয়, একে একে চাচ্চু-ফুফুরাও স্বপরিবারে চলে এলেন। আব্বুর কয়েকজন বন্ধুও এলেন।

আসরের পরে পাড়ার অনেক মুরুব্বীও এলেন। আম্মারের কয়েকজন বন্ধুও এলো। কই আমি তো ওদেরকে দাওয়াত করি নি, তারা কেন এল?

একটু পরে আপু এসে আম্মারকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ভালো করে গোসল করিয়ে দিলেন। একটা ধবধবে শাদা জুব্বা পরিয়ে দিলেন। মাথায় একটা পাগড়িও বেঁধে দিলেন।

আম্মার কিছুই বুঝতে পারছিল না। এমন সময় দাদু এসে আম্মারকে কোলে উঠিয়ে নিলেন। কোলে করে বসার কামরায় নিয়ে এলেন। ওখানে আগত মেহমানরা বসে আছেন। আম্মুসহ অন্য মহিলারা পাশের কামরায় আছেন।

দাদু আম্মারকে কোল থেকে নামিয়ে ঘোষণা দিলেন:

-আমার এই ছোট্ট নাতিটার আজ সাত বছর পুরো হয়েছে। আজ থেকে আম্মার নিয়মিত নামায পড়া শুরু করবে। আমাদের পেয়ারা নবীজি (সা.) বলেছেন, সাত বছর বয়েস হলেই শিশুদেরকে নামায শিক্ষা দিতে।

আপনারা সবাই দু'আ করবেন। আম্মার যেন বাকী জীবনে এক ওয়াক্ত নামাযও যেন বাদ না দেয়।

এরপর সবাই মিলে অনেক দু'আ করলো আম্মারের জন্য। আম্মু আগত মেহমানদের জন্য অনেক মজার মজার খাবার রান্না করেছেন। আম্মারকে সবাই কোলে নিয়ে অনেক আদর করলো। চাচাতো ভাই খালিদ তো তাকে, নামাযি নামাযি বলে খেপাতে লাগলো। আম্মারের পাড়াতো বন্ধু সারিম বললো:

-ইশ! আমার জন্যও যদি এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো!

জীবন জাগার গল্প : ৩১১

জান্নাতের জমি ব্যবসা

শহরে এক ভবঘুরে এল। পরনে রঙচঙে পোষাক। প্রথম কয়েকদিন শহরের অধিবাসীরা লোকটাকে খেয়াল করলো না। লোকটা আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পুরো শহরটা বেশ কয়েকবার চক্কর দিলো।

একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে শহরের লোকেরা দেখল:

-একজন আলখেল্লা পরা লোক শহরের ব্যস্ত রাস্তার একপাশে একটা কম্বল বিছিয়ে বসে আছে। তার সামনে একটা ছোট্ট কাপড়ে লেখা:

"এখানে সুলভ মূল্যে জান্নাতের জমি বিক্রি করা হয়"

পুরো শহরে সাড়া পড়ে গেলো। 'জান্নাতের জমি বিক্রি হচ্ছে? চল চল দেখে আসি'

লোকটার চারপাশে বিশাল ভীড় জমে গেলো। সবাই জান্নাতে এক টুকরো জমি কিনতে চায়। সময় যতই গড়াতে লাগলো, ভীড়বাট্টা ততই বাড়তে থাকলো। লোকটার জমি ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো।

সরল মানুষেরা যার কাছে যা আছে, সেটা বিক্রি করে লোকটার দিকে পতঙ্গের মতো ছুটে আসছে। এ সুযোগ হেলায় হারালে চলবে না।

শহরের অভিজ্ঞজনেরা বুঝতে পারলেন:

-এটা একটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকটা একটা মহা ধাপ্পাবাজ।

ধড়িবাজ এই লোকের খপ্পর থেকে কিভাবে সরল-সাধারণ মানুষের স্বর্বশান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যায় তা নিয়ে পরামর্শ ডাকা হলো।

সবার পক্ষ থেকে একজন লোককে পাঠানো হলো। লোকটা এসে উপস্থিত লোকজনের সাথে কথা শুরু করলো:

-কী হচ্ছে এখানে?

-এখানে জান্নাতের জমি বিক্রি হচ্ছে। এই লোকটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট মূল্যে জান্নাতের জমি বরাদ্দ দেয়ার জন্য। যারাই জমি কিনছে, লোকটা তাদেরকে একটা 'সনদ' দিচ্ছে। মৃত্যুর পর সনদটা ফিরিশতাদেরকে দেখালেই হবে। ফিরিশতারা লোকটার জন্য বরাদ্দকৃত জমির বন্দোবস্ত করে দিবে।

লোকটা দেখলো এটা এক মহা ফিতনা। এভাবে চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ নামায-কালাম ভুলে এ নিয়েই পড়ে থাকবে। ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে জান্নাতের জমি কেনার ধান্দায় থাকবে। কিনতে পারলেই কেল্লা ফতে। জান্নাত তো নিশ্চিত, আর চিন্তা কী? এবার খাও-দাও ফূর্তি করো। মারা গেলে সাথে লোকটার দেয়া 'দলীল' নিয়ে গেলেই ঝামেলা চুকেবুকে গেলো।

লোকটা এতসব কাণ্ড-কারখানা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো। কিভাবে এই পরদেশী মানুষটা এমন অভিনব জালিয়াতি আবিষ্কার করলো? আর কী দেখিয়ে এতগুলো মানুষকে ভোলালো? এই মোহগ্রস্ত মানুষগুলো কি একটুও বুঝতে পারছে না, ব্যাপারটা পুরোই প্রতারণা।

কয়েকজনকে সচেতন করলো, কিন্তু কে শোনে কার কথা। কথা শোনা তো দূরের কথা, তাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিলো। লোকটা চিন্তায় পড়ে গেলো। কিভাবে মানুষকে এই ছলনার ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা যায়? অনেক ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলো। ভীড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে ভিনদেশীকে জিজ্ঞাসা করলো:

-আপনি তো সবার কাছে জান্নাতের জমি বিক্রি করছেন। আমি আপনার থেকে জাহান্নামের জমি কিনতে চাই।

জমি ব্যবসায়ী এই অদ্ভূত প্রস্তাব শুনে নির্বাক হয়ে গেলো। কোনও উত্তর দিতে পারলো না। তখন প্রতিনিধি লোকটা আবার প্রশ্ন করলো:

-জাহান্নামের এক খণ্ড জমি কত দরে বিক্রি করবেন?

ব্যবসায়ী এখন কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উত্তর দিলেন:

-আপনার কাছে আমি জাহান্নামকে বিনে পয়সায় বিক্রি করবো।

-না না, তা হবে না। আমি টাকা দিয়েই জাহান্নাম কিনবো। আপনি জান্নাতের একটা প্লট কত করে বিক্রি করছেন?

-এক হাজার দীনারে। আচ্ছা ঠিক আছে যান, আপনার কাছে আমি জাহান্নামের এক চতুর্থাংশ এক হাজার দীনারে বিক্রি করবো।

-তাহলে তো ভালোই হলো, আমি পুরো জাহান্নামই কিনে নিলাম। এই নিন আপনার চার হাজার দীনার। এবার আমাকে জাহান্নামের দলীলপত্র বুঝিয়ে দিন।

দলীল বুঝে পেয়ে প্রতিনিধি একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে হাঁক দিয়ে বললেন:

-ভাইসব! লক্ষ করে শুনুন। আমি এইমাত্র পুরো জাহান্নাম কিনে নিয়েছি। জাহান্নাম এখন আমার একার মালিকানার। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না। ঠিক করেছি, আমার জাহান্নামে আমি কাউকেই ঢুকতে দেবো না।

তাহলে এখন আপনাদের সামনে জান্নাত ছাড়া আর কিছু রইলো না। জান্নাতের জমি কেনারও আর প্রয়োজন নেই। ব্যবসায়ীর জমি বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলো। অনেকে জোর করে আগে কেনা জান্নাতি জমিরও টাকাও ফেরত নিয়ে গেলো। হুজুগ যেমন উঠেছিলো তেমনি চট করে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

এই ঘটনা মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। পাশের শহরের মানুষ শুনে ভীষণ অবাক হল। তারা একত্র হয়ে বলাবলি করতে লাগলো:

-এত বোকা মানুষও হয়। কেউ চিন্তা করতে পারে এভাবে নিজের টাকা গচ্ছা দিয়ে জান্নাতের জমি কেনার কথা? এভাবে জেনেশুনে কেউ টাকা খোয়াতে রাজি হবে? জমি বেচার ব্যাপারটা যে ফাউ এটা তো একটা ছোট ছেলেও বুঝতে পারবে। ওরা বুঝলো না কেন?

একথা শুনে এক বৃদ্ধলোক বলে উঠলেন:

-তোমরা তাদের কথা শুনে অবাক হচ্ছো কেন? আমাদের মধ্যেও কি এমন বোকামী নেই? আমি তো বলি তারা বরং আমাদের তুলনায় ভালো,

তারা টাকা হারালেও তাদের নিয়ত ভালো ছিলো। আমরা তাদের তুলনায় বেশি বোকা।

-কিভাবে?

-ওই শহরে পাপকাজ খুবই কম হয়। আর আমাদের শহরে কী না হয়? এই আমাদের শহরে যারা মদ খায়, তারা মদটা কি রাস্তাঘাটে কুড়িয়ে পায়, নাকি সুঁড়িখানায় গিয়ে, গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে নেয়?

-পয়সা খরচ করেই কিনে।

-যারা খারাপ জায়গায় যায়, জুয়া খেলে, নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে, তারা সবাই নিজের পয়সা খরচ করেই এসব করে। এটা কি প্রকারান্তরে জাহান্নাম ক্রয় করার নামান্তর নয়?

অথচ আমরা নামায পড়ে, যিকির-তিলাওয়াত করে, খেদমতে খালক করে, নিখরচায় জান্নাত ক্রয় করতে পারি। আমরা বিনামূল্যে জান্নাত ক্রয় করতে চাই না। অথচ পকেটের টাকা খরচ করে জাহান্নাম ক্রয় করতে একপায়ে খাড়া।

ওই শহরের মানুষ তো বোকাটে হলেও ভালো। তারা জান্নাত কিনতে গিয়ে ঠকেছে। আর আমরা জাহান্নাম কিনতে গিয়ে ঠকছি।

ওরা বোকা হলেও ভালো ভালো কাজ করে এমনিতেই জান্নাতের বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে। আমরা চালাক হয়েও টাকা খরচ করে জাহান্নাম ক্রয় করছি।

জীবন জাগার গল্প : ৩১২

সৎকাজের প্রতিদান

রাশাদ আযীয। একজন ইরাকি অভিবাসী। আমেরিকার অ্যারিজোনা রাজ্যে থাকে। পেশায় ট্যাক্সি চালক। তার জীবনের ঘটনা।

-আমি একবার খেপ মেরে বাসায় ফিরছিলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিলো। আমি ছিলাম ভীষণ ক্লান্ত। অনেক দূরের পথ। কোনও রকমে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছিলাম। গাড়ি চলছিলো আপন গতিতে।

রাস্তার দু'পাশে ধু-ধু প্রান্তর। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভরাট পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিক চাঁদের আলোয় ফকফক করছে। মাঝেমধ্যে দু'একটা গাড়ি হুসহাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। এরপর আবার নীরব পরিবেশ। শুধু আমার ট্যাক্সির ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ।

আমি সামনের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। অনেক দূরে রাস্তার ওপর কী যেন পড়ে আছে। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তুটা একজন মানুষ। একজন যুবতী। গাড়ির হেডলাইট দেখে হাত তুললো। এমন অজ-জায়গায় গাড়ি থামাবো কিনা দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এভাবে গাড়ি থামিয়ে আগে অনেকেই বিপদে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটা যেভাবে হাত নাড়ছে, মনে হয় প্রকৃতই বিপদে পড়েছে।

আল্লাহ যা রেখেছেন কপালে, গাড়ি থামালাম। যুবতী ধন্যবাদ দিয়ে পেছনের আসনে উঠলো। গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। যুবতী চুপচাপ চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে আছে। আমিও আর কথা বাড়ালাম না।

আরো আধাঘণ্টা যাওয়ার পর দেখি রাস্তায় এক যুবক। বড় অসহায় ভঙ্গিতে হাত তুলেছে। গাড়ি থামিয়ে তাকেও উঠিয়ে নিলাম।

ভাবনা এলো, কী ব্যাপার! আজ রাস্তায় এত অসহায় মানুষের ভীড় লেগে আছে কেন? এসব ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছি। যুবকটার দিকে তাকিয়ে আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। সে আমার দিকে একটা পিস্তল তাক করে আছে। ভুরু নাচিয়ে গাড়ি থামাতে বললো। আমি গাড়ি থামালাম। আঙুলের ইশারায় নেমে যেতে বললো। আমি সুবোধ বালকের মতো নেমে গেলাম। উদ্যত পিস্তলের সামনে আমার করার কিইবা আছে? গাড়ি থেকে নেমে যুবকটাকে বললাম:

-গাড়ি নিয়েছ ভালো কথা। তবে আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

-কী অনুরোধ বলো।

-পেছনের মেয়েটা অসহায়। তাকে একটু নিরাপদ জায়গা দেখে নামিয়ে দিতে পারবে?

-আচ্ছা দেখি।

আমার ট্যাক্সি আমার চোখের সামনেই আরেকজন চালিয়ে নিয়ে চলে গেলো। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম বিলীয়মান ব্যাকলাইটের দিকে। আস্তে আস্তে ওটা মিলিয়ে গেলো। আমার হাঁটার শক্তি ছিলো না। গায়ের জ্যাকেটটা খুলে, রাস্তার ওপর বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা গুণতে লাগলাম। দু'চোখ লেগে এসেছিলো। চোখের ওপর হেড লাইটের তীব্র আলো পড়ায় ঘুমের চটকা ভেঙে গেলো। চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দু'জন লোক গাড়ি থেকে নামলো। আমি অবাক, গাড়িটা তো

একটু আগে খোয়া যাওয়া আমার ট্যাক্সিটা। আর দু'জন লোকও সেই আগের যুবক-যুবতী। তারা এগিয়ে এসে বললো:

-সরি। তোমার গাড়িটা ফেরত দিতে এলাম।

-কেন?

-তুমি নামার সময় তোমার গাড়ির কথা না ভেবে, একজন অসহায় নারীর কথা আগে ভেবেছ। এটা আমাদের মনে বেশ দাগ কেটেছে। আমরা দু'জন আসলে একই দলের লোক। আমাদের কাজ হলো গাড়ি ছিনতাই করে হিরোইন খাওয়ার পয়সা যোগাড় করা। যত নেশাই করি, একেবারে পশু তো আর হয়ে যাই নি। তোমার মহনুভবতার কাছে আমরা পরাজিত।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৩

অভিমান

ভিয়েতনামের ওপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমেরিকান সৈন্যরা ফিরে আসছে। পুরো আমেরিকা অপেক্ষায়। কেউ পুত্রের অপেক্ষায়। কেউ বন্ধুর অপেক্ষায়। কেউ স্বামীর অপেক্ষায়। কেউ ভাইয়ের অপেক্ষায় দিন গুজরান করছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ঘর। দুইজন বুড়োবুড়ি বিষণ্নচিত্তে বসে আছে। গত তিনদিন ধরে টেলিফোন সেটটা বলতে গেলে কোলের ওপরই আছে। কখন কাঙ্খিত সেই ফোনকলটা আসবে। দু'জনেই বসে বসে ঝিমুচ্ছে। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো। বুড়ো লাফিয়ে রিসিভার উঠাল।

-হ্যালো! কে?

-আমি ডরিক আব্বু।

-ও ডরিক? বাবা কেমন আছো, তুমি এখন কোথায় আছো? কবে ফিরবে?

-এই তো আমি এখন ফিরতি পথে আছি। আম্মু কেমন আছে?

-জ্বি ভালো আছে। জানো ডরিক! আমরা দু'জন তোমার অপেক্ষায় অধীর হয়ে বসে আছি। গত একমাস যাবত আমরা বারান্দা ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও নড়িনি।

-আব্বু! আমার সাথে একজন বন্ধু আছে। সে যুদ্ধে তার দুই হাত ও একটা পা হারিয়েছে। একা একা নড়চড়া করতে পারে না। অন্য একজনর

সাহায্য নিয়ে তাকে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হয়। আমি কি তাকে বাসায় নিয়ে আসতে পারবো? তাকে একা রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। আমরা দু'জন একই ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছি। সে আমাকে বাঁচাতে গিয়েই আহত হয়েছে। টম মানে আমার বন্ধু তার এই অসহায় অবস্থায় বাড়িতে কাছে যেতে চাচ্ছে না। সে আগে যাচাই করতে চাচ্ছে পরিবার তার এই অসহায় অবস্থায়ও তাকে সাদরে গ্রহণ করতে রাজি কিনা।

-ডরিক! বিষয়টা কোনও হাসপাতালের হাতে সোপর্দ করলে তো সহজ হয়। এখানে তো তাকে দেখার কেউ নেই। সে তো আমাদের ওপর একটা বাড়তি বোঝা হয়ে যাবে। হ্যালো ডরিক ! শুনতে পাচ্ছো? কথা বলছ না কেন? হ্যালো!

ডরিক কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো:

-গুডবাই পাপা!

-হ্যালো! ডরিক, হ্যালো! (টোঁ টোঁ টোঁ)।

বৃদ্ধ কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না, ছেলেটা হঠাৎ ফোন কেটে দিল কেন?

দুদিন পর বিকেলে বাসার কলিংবেল বেজে উঠলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দুজনেই দৌড়ে দরজা খুলে দিলেন। দরজায় সামরিক উর্দি পরা এক লোক। বৃদ্ধকে একটা খাম দিয়ে বললো:

-আমরা আপনার ছেলের কফিন নিয়ে এসেছি। আপনি লাশটা গ্রহণ করুন।

-কিন্তু আমি তো আমার ছেলের সাথে দু'দিন আগেই ফোনে কথা বলেছি।

বৃদ্ধ অবিশ্বাস নিয়ে কফিনের ডালা খুললেন। দেখলেন সত্যি লাশটা ডরিকেরই। কিন্তু তার দুই হাত আর একটা পা নেই কেন? তাহলে কি..........

জীবন জাগার গল্প : ৩১৪

হারানো বস্তু

নতুন সাইকেল কিনেছে শাহীন। অনেক আব্দারের পর এই সাইকেল প্রাপ্তি। সুযোগ পেলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বন্ধু সলীম তো আগেই কিনেছে। আগে দুজনে একটা চালাতো, এখন দুজনে দুইটা।

বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাটে পানিও জমেছে। জমে থাকা পানির ওপর দিয়ে সাইকেল চালানোর মজাই আলাদা। পানির বুক কেটে সাইকেলের চাকা যেভাবে তরতর এগিয়ে যায় দেখলে মনে হয় সাগরের বুক চিরে জাহাজ চলছে ।

সেদিন বিকেলে দু'বন্ধু মিলে জোরে সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা করছে। জমে থাকা পানি, খানা-খন্দ কিছুই মানছে, পঙ্খিরাজের মতো সাইকেলকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সামনে ভাঙা রাস্তায় অনেক পানি জমে আছে। দুজন না থেমে সাইকেল চালিয়ে পার হয়ে গেলো। চার চাকার অবিশ্রাম ঘূর্ণনে, খাদের পানি ছিটকে গিয়ে রাস্তার দু'পাশটা ভিজিয়ে দিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ লোক। তার শরীরের নিচের অংশ পুরোটাই ভিজে গেলো।

শাহীন-সলীম বিষয়টা দেখেও না থেমে জোরে সাইকেল চালিয়ে যেতে থাকলো। এটা দেখে বৃদ্ধলোকটা জোরে হাঁক দিয়ে বললেন:

-খোকারা! তোমরা মূল্যবান একটা বস্তু ফেলে যাচ্ছ কিন্তু।

দুজনেই কথাটা শুনে থামল। সাইকেল ঘুরিয়ে বৃদ্ধলোকটার কাছে এসে জানতে চাইলো:

- কী পড়ে গেছে দাদু?

-ভদ্রতা ও শিষ্টাচার।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৫

বিনিময়

মতি মিয়া একজন গরিব মানুষ। সারাদিনে আজ তার কিছুই খাওয়া হয় নি। শরীর অসুস্থ তাই রিকশা নিয়ে বের হতে পারে নি।

তার কুঁড়েঘরের পাশেই এক বড় লোকের বাড়ি। সেখানে আজ বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কত রঙবেরঙের খাওয়া-দাওয়া চলছে। কিন্তু সে পুরো দিনটা উপোসী হয়ে কাটিয়ে দিলো। রাত নামলে মতি আর থাকতে পারলো না। আস্তে আস্তে ঝুপড়ি ছেড়ে বের হয়ে এলো। বিয়ে বাড়ি এখন শান্ত। বাড়ির কর্তা ডেকোরেশনের জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মতি মিয়াকে দেখে চোখের ইশারায় কী চায় জানতে চাইলেন। মতি মিয়া বলল:

- স্যার! আজ সারাদিন কিছু খেতে পারি নি।

- ও, তুমি তো এই পাড়াতেই থাকো।

-জ্বি।

বাড়ির কর্তা এবার একজনকে ডাক দিয়ে বললেন:

-এই, এই লোকটাকে ভেতরে আলাদা করে রাখা ডেগ থেকে এক থালা বিরানি এনে দে।

-এই নাও, বিরানি নেয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে?

-জি না।

-আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এই থালাটা নিয়ে যাও। কাল সকালে পৌঁছে দিলেই হবে। বিরানি একটু বেশি করেই দিলাম।

মতি মিয়া ঘরে এসে বিরানি খেতে বসলো। এক লোকমা মুখে দিয়েই ওয়াক থু করে মুখের বিরানি ফেলে দিলো। তাকে নষ্ট বিরানি দেয়া হয়েছে। খালি পেটেই মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়লো।

দুদিন পরে, মতি সকাল বেলা পাশের বাড়ির থালা দুটো ফেরত দিতে এলো। থালার সাথে এক প্যাকেট ভালো মানের মিষ্টিও আনলো। বাড়ির কর্তা বাগানে হাঁটছিলেন, মতি মিয়াকে দেখে এগিয়ে এলেন। মতি মিয়া বিনয়ের সাথে বললো: -স্যার! থালা দুটো ফেরত দিতে দেরি হয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৬

ভেজা কবর

স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। স্বামী শিয়রের কাছে বসে আছে। স্ত্রী অধীর হয়ে জানতে চাইলো:

-ওগো! আমি মরে গেলে তুমি কি আবার বিয়ে করবে?

-কি জানি? তোমাকে ছাড়া আমার জীবনটা কেমন কাটবে সেটা তো কখনো কল্পনা করে দেখি নি। তুমি নাই এটাই তো ভাবতে পারছি না।

-আমি জানি, তুমি এখন যাই বলো, আমি মারা যাওয়ার পর তুমি বিয়ে করে ফেলবে। তাতে আমার আপত্তি নেই। শুধু আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

-কী অনুরোধ?

-আমার কবরের মাটি না শুকোনো পর্যন্ত তুমি আবার বিয়ে করো না।

-কী আশ্চর্য! আমি দিনরাত তোমার চিকিৎসার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি, তুমি দেখি মরার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছো।

এর কয়দিন পর স্ত্রী মারা গেলেন। স্বামী নিয়মিত কবর যিয়ারত করতে যান। কিছুদিন যাওয়ার পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এতদিন হয়ে গেল, কবরটা এখনো সেই প্রথমদিনের মতোই ভেজা। বিষয়টা তাকে ভাবিয়ে তুললো।

একদিন সকালবেলা সময় না পাওয়াতে অসময়ে বিকেলে স্ত্রীর কবর যিয়ারত করতে গেলেন। দেখলেন তার ছোট শ্যালক বোনের কবরের ওপর পানি ঢালছে।

-কিরে তুমি এখানে কী করছো?

শ্যালক অপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিলো

আপুর কবরে পানি দিচ্ছি।

-কেন?

-আপু মারা যাওয়ার আগে বলে গেছেন, আমি যেন কেউ না জানে মতো করে, তার কবরটাকে প্রতিদিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৭

ফিরিশতা

এক মা তার ছোট ছেলেকে ঘুমপাড়ানি গল্প বলছেন।

-খোকা! একটা গল্প শুনবে?

-জ্বি, আম্মু।

-তাহলে শোন। একটা শিশু বয়েস যখন নয় মাস হয়, তখন আল্লাহ শিশুটাকে বলেন:

-তুমি অচিরেই জন্মগ্রহণ করবে। তোমাকে আর মায়ের উদরে রাখা যাবে না। পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবো।

শিশু তখন কেঁদে দিয়ে আল্লাহর কাছে জানতে চায়:

-আমি ছোট্ট মানুষ, বড় বড় মানুষদের সাথে কিভাবে থাকবো?

-তুমি কোনও চিন্তা করবে না। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে।

-আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো?

-সেই ফিরিশতাই তোমাকে শিখিয়ে দেবে।

-আমি কিভাবে জীবন গঠন করবো?

-ফিরিশতাই তোমাকে শিখিয়ে দেবেন।

-দুঃখ-কষ্টে, বিপদাপদে কে আমাকে দেখবে?

-এসব নিয়ে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় সব সময় সেই ফিরিশতাকে তোমার পাশে পাবে।

-আমি তাকে কিভাবে চিনবো?

-খুব সহজেই তাকে চিনতে পারবে। সেই ফিরিশতাকে সবাই 'আম্মু' বলে ডাকে।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৮

শয়তান ও খোমেনী

তেহরানের এক জমকালো প্রাসাদ। রাতের বেলা দুইজন লোক বসে বসে গোপনে কী সব শলা-পরামর্শ করছে। শয়তান এ দৃশ্য দেখে কৌতূহলী হলো। জানলার শার্সিতে চোখ লাগিয়ে দেখলো, আয়াতুল্লাহ খোমেনী আর আয়াতুল্লাহ সীস্তানী বসে আছে। শয়তান ভেতরে গিয়ে খুক করে কাশি দিলো।

-কে কে?

-আমি, আপনাদের ছাত্র ইবলিস শয়তান।

-আরে হুযুর! আপনি বলছেন কি? আপনি আমাদের ছাত্র হতে যাবেন কোন দুঃখে? আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি এই গরিবালয়ে এসেছেন! কী সৌভাগ্য আমাদের। আসুন আসুন! বসুন।

-না না, বসার সময় নেই। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা আবদার নিয়ে।

-কী আবদার?

-আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে চাই।

-কী শিখতে চান?

-আমি সৃষ্টির শুরু থেকেই আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করে আসছি। কিন্তু আমি যতই তাদেরকে বিচ্যুত করি, তারা গোনাহ করার পর অনুশোচনায় তাওবা করে ফেলে। আমার সব পরিশ্রম মাঠে মারা যায়।

কিন্তু আপনারা মাশাআল্লাহ! আপনার সরাসরি পাপটাকেই আপনাদের অনুসারীদের কাছে পূণ্যরূপে তুলে ধরেছেন। ফলে তারা পাপ করে কিন্তু তাওবা করার প্রয়োজন বোধ করে না। আমি শয়তান হয়েও পাপকে পূণ্যরূপে উপস্থাপন করতে পারি নি।

-সেটা কিভাবে?

-এই যে আপনারা মুত'আ বিয়েকে বৈধতা দিয়েছেন। অথচ আপনারা যে পদ্ধতিতে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেন, তাতে বোঝা যায়, এটা সুস্পষ্ট ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ বাস্তবে হয় কি? একজন মুত'আকারী শী'আ মনে করে, সে মুত'আ করে অনেক বড় পূণ্যের অধিকারী হয়ে গেলো।

আপনারা তাদেরকে বুঝিয়েছেন, কবরপূজা সেটা আহলে বাইতের মহব্বতের তাগিদে করা হয়। এটা করে শী'আরা শিরকে লিপ্ত হয়, তাওবা করে না।

আপনারা তাদেরকে বুঝিয়েছেন, আহলে বাইতের সম্মানের খাতিরে, আল্লাহ তা'আলা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা খারাপ কিছু নয়। কখনো আপনারা বলেন:

-ফাতিমা তার পিতার চেয়েও উত্তম।

কখনো বলেন:

-আলী (রা.) আল্লাহর চেয়েও শক্তিশালী।

মানুষজন আপনাদের অনুসরণ করে চলে। তারা তাওবা করে না।

এবার বলুন আমি শ্রেষ্ঠ না আপনারা শ্রেষ্ঠ? কে গুরু আর কে শিষ্য? আমি কি আপনাদের সমকক্ষ কখনো হতে পারবো?

খোমেনী বলল:

-ঠিক আছে, এতক্ষণ তো অনেক কিছুই আমাদের কাছে শিখলেন। এবার এই বাবদ কিছু টাকা ছাড়েন।

শয়তান রেগে গিয়ে বললো:

-কী, আমি মানুষকে গোমরাহ করি কোনও বিনিময় ছাড়াই। কিন্তু মানুষ আমাকে একা রেখে, সে গিয়ে তাওবা করে ফেলে। আমার আর কিছুই থাকে না। সব হারিয়ে আমি একা হয়ে পড়ি। নতুন করে আবার কাজ শুরু করতে হয়।

আর আপনারা মানুষকে গোমরাহ করেন। আবার তার বিনিময়ও গ্রহণ করেন। আপনারা তো দেখছি ভয়ংকর লোক। আল্লাহ আমাকে আপনাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন।

শয়তান দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩১৯

হেল্পার

বাসে করে শাহবাগ যাচ্ছি। সামনে আসন না পেয়ে একদম পেছনে বসে আছি। বাসে ভাড়া কাটছে ছোট্ট এক বালক।

-স্যার ভাড়াটা দিন

-পরে আয়।

-পরে আবার কখন? এখনই দিয়ে দিন না।

-এই হেল্পারের বাচ্চা হেল্পার, এত ক্যাটক্যাট করিস কেন?

-আমি কই ক্যাটক্যাট করলাম। আমি তো ভাড়া চাইলাম।

-এই ব্যাটা এই মুখে মুখে তর্ক করিস? তোর সাহস তো কম না? দেবো এক থাপ্পড়।

-থাপ্পড় দিলে দেন, তবুও ভাড়াটা দিয়ে দেন। অন্য প্যাসেঞ্জারের ভাড়া কাটতে হবে।

ঠাস!

যাত্রীটা সজোরে এক চাঁটি বসিয়ে দিলো। ছেলেটা কেঁদে ফেললো। অন্য যাত্রীরা বিষয়টা বেশ উপভোগ করছে বলে মনে হলো। তাল ঠুকে বললো:

-দিন ব্যাটাকে আরো কয়েকটা লাগিয়ে দিন। বড় বাড় বেড়েছে ওদের। বাংলাদেশটা যেন ওরা কিনে নিয়েছে।

লোকটা ভাড়া তো দিলোই না, তার উপর আরো বকাবকি করতে লাগলো।

আমরা কোন দুনিয়ায় বাস করছি?

বাসের হেল্পারও তো একজন মানুষ। আমাদের আর ওদের মাঝে পার্থক্য কোথায়। সবাই আল্লাহর বান্দা।

জীবন জাগার গল্প : ৩২০

ভদ্র যুবক

একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবকের বৈশিষ্ট্য:

এক: গাড়িতে বা কোথাও অপরিচিত একসাথে বসতে বাধ্য হলে নিজেকে গুটিয়ে রাখে, পাছে মেয়েটির সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়।

দুই: বাসে বসা থাকলে, দাঁড়িয়ে থাকা নারীর জন্য আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায়। বসার জন্য জায়গা দিয়ে দেয়।

তিন: রাস্তায় অন্যের মা-বোনের পেছনে লাগে না। যাতে নিজের মা-বোনও নিরাপদ থাকে।

চার: তার সামনে কোনও মেয়ে থাকলে দ্রুত পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যায়, যাতে নজর না পড়ে।

জীবন জাগার গল্প : ৩২১

গোলাব ও মুক্তো

একদিন ঘটনাক্রমে গোলাব আর মুক্তোর সাক্ষাত হয়ে গেলো। গোলাবটা ছিলো সৌন্দর্যে, রঙে, সুঘ্রাণে অতুলনীয়। সে তুলনায় মুক্তোটাকে অতটা আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিলো না। সেটা থাকে সাগরের গভীর তলদেশে। গোলাব বললো:

-আমি এক বড় পরিবারের সন্তান। আমাদের পরিবারের সন্তান-সন্ততি যে কতো তার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে বলে মনে হয় না। কত রঙের যে গোলাব হতে পারে কল্পনাও করতে পারবে না।

কিন্তু এতসব বৈশিষ্ট্য আর সৌভাগ্যের পরও আমার মনটা ভালো নেই। মনটা বড় বিষণ্ন।

মুক্তোদানা: তোমার মন খারাপ কেন? তুমি এতক্ষণ যেসব গুণের কথা বললে, সেসবে তো মন খারাপ হওয়ার কথা নয়?

গোলাব: মানুষ আমাদের সাথে বড়ই অবহেলার আচরণ করে। তারা আমাদের চাষ করে যেন আমাদের সুন্দর রূপ তারা উপভোগ করতে পারে। তারা আমদেরকে গুরুত্ব দেয় আমাদের ঘ্রাণ নাকে নেয়ার জন্য। তারা আমাদেরকে সত্যিকারর্থে ভালোবাসে না।

আমরা একটু বাসি হলেই,তারা আমাদেরকে রাস্তার পাশের নর্দমায়, ময়লার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমাদের রূপ আর সুবাসই তাদের কাছে মূল্যবান। এগুলো ফুরোলেই আমরা মূল্যহীন হয়ে যাই।

গোলাব দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো:

-তোমার জীবন কেমন? বলো তো শুনি? তুমি কিভাবে জীবনযাপন করো? তুমি সবসময় সাগরতলে লুকিয়ে থাকো, তোমার অনুভূতিটা জানতে ইচ্ছে করছে।

মুক্তোদানা: আমি তোমার মতো সুন্দর রঙের অধিকারী নই। তোমার মতো সুন্দর সুবাসও আমার নেই। তবুও মানুষ আমাকে খুবই পছন্দ করে। আমাকে তারা খুবই মূল্য দেয়। তারা আমাকে পাওয়ার জন্য অসম্ভব সব কাজ করে।

আমি বাস করি ঝিনুকের কঠিন খোলের মধ্যে। আমার ঘরবাড়ি সাগরের গহীন তলদেশের অন্ধকারে। তবুও আমি সুখী। আমি অত্যন্ত সুখী। আমাকে নিয়ে মানুষ যা ইচ্ছা করতে পারে না। ইচ্ছা করলেই আমাকে দেখতে পায় না। চাইলেই আমাকে ছুঁতে পারে না।

মানুষ আমাকে পাওয়ার জন্য আঁটঘাঁট বেঁধে প্রস্তুতি নেয়। সাগরের গভীর তলদেশে ডুব দেয়। আমি সাগরের যত গভীরে বাস করি, যতই মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকি ততই আমার মূল্য বেড়ে যায়। আমার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। আমার মূল্য বেড়ে যায়।

কে বেশি গ্রহণযোগ্য? খোলামেলা গোলাব নাকি ঝিনুকের খোলের সুরক্ষিত মুক্তোদানা?

জীবন জাগার গল্প : ৩২২

ইওরোপের আধুনিক সভ্যতা

ড. মুহাম্মাদ তাওফীক। নিউরোসার্জন। ইংল্যান্ডের লিচেস্টার শহরের অধিবাসী।

নয়মাস আগে। দুর্বৃত্তরা তার পুরো পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করে দিয়েছে। স্ত্রী আর তিন সন্তান। আদালত আটজনকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছে।

ড. তাওফীক ছিলেন ডাবলিনে। তার কর্মস্থলে। দুর্বৃত্তরা তখন তার বাড়ির ওপর চড়াও হয়। ঘরের সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিলো। ঘুমন্ত অবস্থাতেই সবাই

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার এক ঘণ্টা আগেও তিনি সবার সাথে কথা বলেছেন।

পুরো ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, অলৌকিকভাবে অক্ষত থেকে যায় ঘরের তিনটা কুরআন শরীফ।

পাশাপাশি কিছু টাকাও অক্ষত থেকে যায়। এই টাকাগুলো তার স্ত্রী ও সন্তানরা জমিয়েছিলো, ডাবলিনে একটা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে।

মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পর, আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে, ডা. তাওফীক বলেন:

-তারা (পরিবারের সদস্যরা) অন্যদেরকে জীবনের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করতো। তারা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতো। তাদেরকে ভালো হওয়ার দিকে আহ্বান করতো।

তারা সত্যিই চমৎকার মানুষ ছিলো। সত্যিই অসাধারণ মানুষ ছিলো। জনকল্যাণমূলক কাজে তারা সবসময় অগ্রগামী ছিলো।

-আমার মেয়ে যয়নবও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকতো। মেয়েটা সবসময় হাসিমুখে থাকতো। অল্পতেই সবাইকে আপন করে নিতো। স্কুলে এবং বাসায় সব জায়গায়। তার এই বছরই লেখাপড়া শেষ হওয়ার ছিলো। বিয়েও ঠিকঠাক ছিলো।

-আমাদের বড় ছেলে বিলাল। সে ছিলো অতুলনীয় একটা ছেলে। আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা। তার বয়স ষোল। এ বয়েসেই সে একটা ধর্মীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলো। কবিতাও লিখতো। আমার এই আব্বুটা কুরআনের হাফিয ছিলো। মাদরাসা শিক্ষার প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলো সে।

-ছোট ছেলে জামিল। সদা হাস্যময় মুখ। মিশুক। তার অনেক বন্ধু ছিলো। তারও কুরআন হিফয শেষ হওয়ার পথে ছিলো। সে খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারতো। স্পিনি হিলের সবুজ মাঠে। সেও এই বছর, হিফয শেষে মাদরাসার শিক্ষাকোর্সে ভর্তি হতো।

- সেলিনা। আমার প্রাণাধিকা স্ত্রী। সেও পাঁচ বছর মেয়াদি ধর্মীয় শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করেছিলো। এই তো গত বছরই।

-এই চারজন মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ ছিলো এক সাথে থেকে সমাজ ও মানবতার সেবা করা।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে:

-আপনি হত্যাকারীদেরকে ঘৃণা করেন কি না?

-আমি কোন মানুষকে ঘৃণা করি না। আমি অপরাধ বা পাপকে ঘৃণা করি।

-অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ হলেও, হত্যাকারীরা আদালতে তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে নি। তারা মিথ্যা বলেছে। তাদেরকে এই মিথ্যা বোঝা নিয়েই বাকি জীবন বাঁচতে হবে।

-আমি বিচারকার্য দেখার জন্য, আদালতে নিয়মিত হাজির থেকেছি। আমি বুঝতে চেয়েছি, আমার প্রাণের মানুষগুলোর সাথে আসলে কী করা হয়েছিলো। এবং অপরাধীদের কী পরিণতি হয় সেটা দেখাটাও প্রয়োজন ছিলো।

-আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, গত নয়মাস ধরে যারা আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। খৃস্টান-মুসলিম-হিন্দু-শিখ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে লিচেস্টার পুলিশকে।

-এখন ইংল্যান্ডে আমার পরিবারের কোনও সদস্য জীবিত নেই। কিন্তু এ কয়দিনে আমি অনুভব করেছি:

পুরো ইংল্যান্ডের অধিবাসীই আমার পরিবার।

-সারা বিশ্বের মানুষদের প্রতিও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, তারা আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন। দু'আ করেছেন।

-আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মিডিয়াকর্মীদের প্রতি। তারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমার বিষয়টাকে বিবেচনা করেছেন।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৩

তিরয়াক-মহৌষধ

আজ সাত মাস হতে চললো, লোকটা মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রে আছে। কিন্তু কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। রোগটা হলো, সারাক্ষণই মনটা বিষণ্ন থাকে। কাজেকর্মে মন বসে না।

ডাক্তাররাও হতাশ। এক প্রকার জোর করেই তারা লোকটাকে রিলিজ করে দিলো। লোকটা গত্যন্তর না দেখে, পাততাড়ি গুটিয়ে বের হয়ে এলো। উপায়ান্তর না দেখে এক বুযর্গের দরবারে হাজির হলো।

-হুযুর! আমার মনে সারাক্ষণই একটা মরা মরা ভাব থাকে। কোনও কাজে স্ফূর্তি পাই না। আমি এখন কী করতে পারি?

-তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবো, ঠিক ঠিক উত্তর দিবে।

ক: তুমি কি সময়মতো নামায পড়ো?

-জ্বি না।

-তাহলে আমার অসিয়্যাত হলো, তুমি সবার আগে মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবে। পারলে আযান শেষ হওয়ার আগেই মসজিদে হাযির হয়ে যাবে।

খ: তুমি সকাল বিকেলের মাসনূন দু'আগুলো নিয়মিত পড়ো?

-জ্বি না।

-তাহলে এই ছোট পুস্তিকাটা নিয়ে যাও, এখানে যেভাবে দু'আগুলো পড়তে বলা হয়েছে, সেভাবে পড়ো। এতে আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো, তোমার সব সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। তোমার রোগের চিকিৎসা আছে। তোমার বর্তমান অবস্থার উন্নতির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে।

গ: তোমার ঘরে কি টিভি-কম্পিউটার আছে?

-জি।

-এ-দুয়ের অপব্যবহারের কারণেই, ঘরে ঘরে বিভিন্ন বালামুসীবত আসে। পাপের উপসর্গগুলো প্রবেশ করে। আখিরাত-বিমুখতার জীবাণু আসে।

ঘ: তুমি কি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করো?

-জ্বি না।

-তুমি প্রতিদিন অন্তত এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হও। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়)।

লোকটা চলে গেলো।

দশদিন পর আবার খানকায় এলো। মুখে হাসি। চোখে উৎসাহ। চলন-বলনে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। শায়খকে বললো:

-আপনার বাতলে দেয়া পথে চলতে চলতে, আল-হামদুলিল্লাহ! দশদিনের মাথায়ই আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩২৪

ইমাম শা'বী (রহ.)

ইমাম শা'বী রহ. ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সবসময় হাসিখুশি থাকতেন। ফিকহের মাসআলার উত্তর দানের সময়ও তার স্বভাবসুলভ কৌতুকবোধ ফুঠে উঠতো।

এক লোক তাঁর কাছে জানতে চাইলো:

-শায়খ! আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি! বাড়ি এসে দেখলাম, মহিলাটা ল্যাংড়া। এখন তাকে ফিরিয়ে দেয়াটা কি আমার জন্য জায়েয হবে?

-তুমি যদি স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করার জন্য বিয়ে করে থাক, তাহলে জায়েয হবে।

আরেক লোক এসে ইমাম সাহেবের কাছে প্রশ্ন করলো:

-শায়খ! আমি যখন নদীতে গোসল করতে নামি, কোনদিকে মুখ করে সাঁতার কাটবো? কিবলার দিকে মুখ করে নাকি কিবলার দিকে পিঠ করে?

-তুমি বরং তোমার জামাকাপড়ের দিকে মুখ করে সাঁতার কাটবে, যাতে সেগুলোর চুরি যাওয়া ঠেকাতে পারো।

আরেক লোক প্রশ্ন করলো:

-শায়খ! আমি কি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শরীর চুলকাতে পারবো?

-হাঁ, পারবে!

-কতটুকু পরিমাণ চুলকাতে পারবো?

-একদম হাড্ডি দেখা যাওয়া পর্যন্ত।

সমাপ্ত

আলহামদুলিল্লাহ